মে ২০২২ ■ বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের
সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

আমরাই পারব

মা তোর বদনখানি মলিন হলে

সাবিহা তাসবীহ, সপ্তম শ্রেণি, বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা

তালুকদার ফারহান আল আবরার, ৪র্থ শ্রেণি, শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমি, শেরপুর

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। শ্রমজীবী মানুষের দাবি আদায়ে ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর হে মার্কেটে শ্রমিকদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ দিনটি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এবারের মে দিবসের প্রতিপ্রাদ্য– 'শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা'।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা সে সময় বিদেশে থাকায় ঘাতকদের হাত থেকে বেঁচে যান। দীর্ঘ ৬ বছর নির্বাসনে থাকার পর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন শেখ হাসিনা। তাই এ দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি ঐতিহাসিক দিন।

ছোট্ট বন্ধুরা, আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ৭ই মে। আবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন মে মাসের ২৫ তারিখ। আমরা প্রিয় দুই কবিকে স্মরণ করি আন্তরিক শ্রদ্ধার সাথে।

৮ই মে বিশ্ব মা দিবস। মা পৃথিবীর সবচেয়ে আপন ও প্রাণের একটি শব্দ। আর তাই মা দিবসকে স্মরণ করে বছরের প্রতিটি দিন যেন হয়ে ওঠে মাকে ভালোবাসার দিন।

ভালো থেকো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা।

নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসা ১৭ই মে, ১৯৮১

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

নিবন্ধ

মে দিবস/হারুন-উজ-জামান ০৩
আমরাই পারব/মোহাম্মদ হাননান ০৫
জ্যাকসন হাইটসে লাল-সবুজ পতাকা/ফরিদুর রেজা সাগর ০৭
বিচিত্র কিছু ডাইনোসর/শামস্ নূর ২৫
বিতর্কে হাতেখড়ি/নাজমুল হুদা ৩০
নজরুলের নাম সমাচার/এস এম সিহাব ৩৮

গল্প

মা তোমাকে মনে পড়ে/আমীরুল ইসলাম ১০
মা তোর বদনখানি মলিন হলে/নাসরীন মুস্তাফা ১২
রাতিনের লাল ঘুড়ি/রফিকুল নাজিম ১৪
নূরী ও ভেড়ার ছানা/জুয়েল আশরাফ ১৭

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

রতপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ ৪১

সাফল্য প্রতিবেদন

বাংলাদেশের আলপনা গ্রাম/শাহানা আফরোজ ৪৯
বক্সিংয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জয় বাংলাদেশের/মেজবাউল হক ৫১
বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর রোবট আবিষ্কার/মো. জোবায়ের হোসেন ৫২
আরেক পৃথিবী /ইফতেখার আলম ৫৩
মাঙ্কিপক্স আতঙ্ক নয় চাই সচেতনতা/মো. জামাল উদ্দিন ৫৫
কন্যাশিশু/জান্নাতে রোজী ৫৭
চাঁদের মাটিতে গাছ/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৫৮
দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি ৫৯
বুদ্ধিরতে ধার দাও/নাদিম মজিদ ৬০

কবিতায় রবীন্দ্র-নজরুল

০৯ আহসানুল হক/ নীলিমা শীল

মজার কবিতা

২১ কবির কাঞ্চন/মাহমুদ রাজু
২২ বিচিত্র কুমার/এম হাবীবুল্লাহ
২৩ রফিক আমিন/হাসু কবির

কবিতাগুচ্ছ

২৯ রোমানুর রোমান
৩৩ মো. মোস্তাফিজুর রহমান
৩৪ বেগম দিলরুবা খালেদা আমিন/বারী সুমন
৩৫ গাজী আরিফ মান্নান/শাহ্ সোহাগ ফকির

ছোটোদের গল্প ও ছড়া

২৪ মুহাম্মদ বিহাম
১৩ সায়মা আদিবা আভা
১৬ ফাহমিদা আক্তার
৪০ তৌফিক আলম/মো. জাওয়াদ আলম/মৌমিতা হোসেন

রূপকথার গল্প

৩৬ জাদুই প্রাসাদ/অনুবাদ: আহমেদ জসিম

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : সাবিহা তাসবীহ/তালুকদার ফারহান আল আবরা
৬৩ ইরিনা হক/মো. রাশেদুল ইসলাম
৬৪ সানজিদা আক্তার রূপা/আনিশা চৌধুরী

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

মে দিবস

হারুন-উজ-জামান

প্রত্যেক বছরের মে মাসের প্রথম দিনকে বলা হয় মে দিবস। শ্রমিক শ্রেণির জন্য এ দিনটির গুরুত্ব অনেক। মে দিবসকে তাই বলা হয় মহান মে দিবস। কিন্তু পহেলা মে কে কেন মহান মে দিবস বলা হয়- তার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। কী সে কারণ? কারণটা হলো- এককালে শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টার কোনো হিসাব ছিল না। মালিকদের খেয়াল খুশিমতো শ্রমিকদের কাজ করতে হতো। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে শ্রমিকদের দৈনিক বিশ ঘণ্টা কাজ করা ছিল বাধ্যতামূলক। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ ঘণ্টার কর্ম দিবসের জন্য অনেক আন্দোলন হয়। ক্রমে ক্রমে শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার ঘটে। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার নামে এক শ্রমিক সংগঠনের। দিনব্যাপী পরিশ্রমের তুলনায় শ্রমিকদের মজুরি ছিল খুবই কম। তাছাড়া একটা মানুষের ন্যূনতম যতটুকু বিশ্রাম প্রয়োজন- সেটুকুও তারা পেত না।

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার এক সম্মেলন ডাকে। সিদ্ধান্ত হয়- ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা মে থেকে সারা বিশ্বে কোনো শ্রমিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবে না। কিন্তু কারখানার ধনী মালিকেরা কোনোভাবেই এই প্রস্তাব মানতে রাজি হয়নি। এতে করে শ্রমিকদের অসন্তোষ আরো তীব্র হতে থাকে। অবশেষে আসে পূর্বঘোষিত সেই দিন। ঐতিহাসিক পহেলা মে, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ। দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের ‘হে মার্কেট’ নামক স্থানে প্রায় পাঁচ লাখ শ্রমিক যোগ দেয় ধর্মঘটে। সম্মেলনে শ্রমিকদের শ্লোগানে শ্লোগানে সেদিন প্রকম্পিত হয়ে ওঠে পুরো ‘হে মার্কেট’ এলাকা। শাসক শ্রেণি এত লোকের সমাবেশ দেখে আরো উত্তেজিত হয়। শ্রমিকদের আন্দোলন ভণ্ডুল করার জন্য এক পর্যায়ে শ্রমিকদের ওপর গুলি ছোঁড়ে পুলিশ। নিহত হয় ১০ জন শ্রমিক। এর ফলে পরিস্থিতি আগুনে ঘি ঢালার মতো অবস্থা হয়। অর্থাৎ আগুনে ঘি ঢাললে আগুন যেমন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি শ্রমিক নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিক জনতা। আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বে ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবি মেনে নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় রক্তের বিনিময়ে পাওয়া শ্রমিক অধিকার। তাই এ দিনকে মহান মে দিবস বলা হয়।

১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই ফরাসি বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশে সিদ্ধান্ত হয়, ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রতি বছর পহেলা মে আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিক সংহতি দিবস পালন করা হবে। সে মোতাবেক অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রতি বছর মে দিবস পালন হয়ে আসছে। অবশ্য অবিভক্ত ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় মাদ্রাজে, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে সরকারিভাবে পালিত হচ্ছে পহেলা মে। বেসরকারিভাবে এ দিনটি পালিত হয় আরো অনেক দেশে। ৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে সরকারিভাবে পালিত হয় মে দিবস। অবশ্য বেসরকারিভাবেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করে থাকে এ দিনটি। বর্তমানে মে দিবসকে বলা হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। মজার ব্যাপার হলো পহেলা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের উৎপত্তি হলেও যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু পহেলা মে কে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক দিবস পালন করা হয় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার।

বাংলাদেশে প্রতি বছর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সরকারিভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস পালন করে আসছে। এ দিন সরকারি ছুটি থাকে। দিনটি উপলক্ষ্যে প্রতি বছর মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথকভাবে বাণী দিয়ে থাকেন। জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিশেষ ক্রোড়পত্র। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতীক হিসেবে মে দিবস পালিত হবে যুগ যুগ ধরে। ■

সাবেক যুগ্ম সচিব, সাংস্কৃতিক ও অধিকার কর্মী

আমরাই পারব

ড. মোহাম্মদ হাননান

সামাজিক ও পারিবারিক সুরক্ষাগুলো আমাদের ব্যক্তি জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে এটা প্রভাব ফেলে শিশু-কিশোরদের জীবনে। ছোটোবেরা থেকেই সে যখন দেখবে তার পরিবারে নৈতিকতার আদর্শ চলে তখন তার মানসিক গড়নটিসেভাবেই বিকশিত হয়। বর্তমান কালের শিশু-কিশোররা সরাসরি সমালোচনা খুব বেশি নিতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন অভিভাবকদের আবেগ নির্ভর দরদ ও ভালোবাসা। বলা যায়, 'আমাদের কালে আমরা একাজগুলো এভাবে করেছি।' সমাজে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাগুলো যা তার বিরুদ্ধেও ঘটেছে, তার প্রতি তাকে সহিংস না করে সহনশীল ও ধৈর্য শিক্ষা দেওয়া, যাতে সেও পাল্টা একটি নিষ্ঠুর আচরণ করে না ফেলে।

বাংলাদেশের প্রতি চারজন ফেসবুক ব্যবহারকারীর একজন কিশোর, বালক অথবা বালিকা। এরা পরস্পর যে কেউ যে কাউকে প্রভাবিত করে ফেলতে পারে। এ প্রভাবে পড়ে অনেক সময় আবেগের বশে এমন সব ছবি পাঠিয়ে ফেলে যা তাকে আত্মহত্যার ইশারা দেয়। ইন্টারনেটে এরকম অনেক ঘটনার কথাই এখন প্রতিদিন আমাদের সামনে আসছে। করোনাকালে এবং এ করোনার প্রকোপের পরও এসব ঘটনা বেড়ে গেছে। কারণ স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল, কাজ ছিল না অবসর জীবন এই সময়টায় শিশু-কিশোররা ভুল নগ্ন পথে পা ফেলছে।

তাদের বাঁচাবে কে? করোনাকালে এবং করোনাকালের পরে আমাদের অভিভাবক, আমাদের গণমাধ্যম, আমাদের সামাজিক নেটগুলো যা করতে পারত, তা কি তারা করতে পারছে। ৩রা অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের একটি প্রধান দৈনিক একটি সংবাদ ছেপেছে, 'দিনটি প্রেমিকদের' শিরোনাম করে। পত্রিকাটি তারপর শেষে আরো বিস্তারিত লিখেছে, 'আজ ৩ অক্টোবর বয়ফ্রেন্ড দিবস'। ইন্টারনেটের বিভিন্ন সূত্র বলছে, ২০১৪

সালে যাত্রা শুরু হয় দিবসটির। ২০১৬ সাল থেকে এটি জনপ্রিয় হতে শুরু করে। জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে গণমাধ্যমগুলোর প্রচারণা।

পরদিন ৪ঠা অক্টোবর আমার মোবাইল ফোনে পরপর দুটো ম্যাসেজ পেলাম ফোন কোম্পানি থেকে, 'ভালোবাসা-প্রেমের টিপস পেতে ডায়ল করুন .. .. .. । চার্জ ২.৬৭টাকা'।

এ দেখে মনে পড়ল, আশির দশকের শুরুতে একটি পত্রিকা প্রথম চালু করেছিল 'ভ্যালেন্টাইন ডে'। আমরা দেখেছি এখন এর বিকৃত রূপ ও কুপ্রভাব শিশু-কিশোর থেকে তরুণ-তরুণীদের খেয়ে ফেলছে। এখন অনেক গণমাধ্যম এর বিরুদ্ধে লিখছে। কিন্তু এখন আর লিখে কী হবে! ঘটনা তো ঘটে গিয়েছেই।

এখন ভালোবাসা-প্রেমের টিপস বিক্রি করছে মোবাইল কোম্পানিগুলো। সংবাদপত্র চালু করতে চাচ্ছে 'বয়ফেন্ড দিবস', এর আগে সংবাদপত্র চালু করেছিল 'ভ্যালেন্টাইন ডে'। এগুলো আমাদের সমাজে যে কুপ্রভাব ফেলছে তার দায় থেকে আমরা কি মুক্তি পাব?

সাম্প্রতিক সময়ে বরগুনায় রিফাত শরীফ হত্যার দায়ে তার স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নীর ফাঁসির আদেশ হয়েছে। আদালত মামলার পর্যবেক্ষণে বলেছে, 'আয়শার সর্বোচ্চ শাস্তি না হলে অন্য মেয়েরাও বিপথগামী হবে'। আয়শার বিপথগামীতার জন্য দায়ী কি একমাত্র আয়শাই, আয়শা সামাজিক মাধ্যমে অন্যের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল অন্য তরুণের সঙ্গে, যে রকম সম্পর্ক গড়ার জন্য সংবাদপত্র ও মোবাইল কোম্পানিগুলো উসকানী দিচ্ছে, তাদের দায়ের কথা কেউ তো বলছে না। এখন তো আমাদের কিশোরী মেয়ে আয়েশার ফাঁসি হয়ে গেল!

এসব ঘটনা ঘটেছে এই করোনাকালে এবং করোনার পরেও তা অব্যাহত আছে। সুরক্ষায় যেখানে অগ্রাধিকার পাবে কিশোর নারী ও শিশুরা, সেখানে তাদের ফাঁসি হচ্ছে। আমরা কি দেখব সমাজে এ ঘটনাগুলোর জন্য কারা দায়ী? সবকিছু তো সরকার করে দেবে না, আমাদের দায়িত্ব ও দায় আমরা তো এড়াতে পারি না। আমাদের অভিভাবকরা না করলে এখন শিশু-কিশোর নিজেদেরই এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। শিশু-কিশোরদের সামনে এখন স্বপ্ন। স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাকে মোবাইল ফোন, ফেসবুক, ইউটিউব নয়, মনোযোগ দিতে হবে লেখাপড়ায়। বেঁচে থাকতে হবে এসব অপশক্তি যারা আমাদের ক্ষতি করছে তাদের হাত থেকে।

পারব না আমরা ! কী বলো আমার প্রিয় শিশু-কিশোররা। ■

সাবেক সিনিয়র সম্পাদক (সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ) এবং গবেষক

জ্যাকসন হাইটসে লাল-সবুজ পতাকা

ফরিদুর রেজা সাগর

জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্কের পুরনো বাঙালিপাড়া। কেউ নিউইয়র্ক গিয়েছেন আর জ্যাকসন হাইটস ঘুরে যাননি এমন ঘটনা ঘটেনি। রুজভেল্ট সাবওয়ের পাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জ্যাকসন হাইটস। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। মাঝখানে আছে ডাইভার্সি প্লাজা। সেখানে বাঙালিদের আয়োজনে নানা অনুষ্ঠান হয়। পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর পালিত হয়। চারপাশে বাঙালিদের দোকান। বাঙালি খাবার। বাঙালি পোশাক, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বাঙালি তৈজসপত্রের সুপার সপ, মোবাইল ফোন, কাবাব বিরানির দোকান– সবই আছে জ্যাকসন হাইটসে। যেন এক টুকরো বাংলাদেশ। সেখানে বাংলায় কথা চলে।

জ্যাকসন হাইটসে গেলে ভালোই লাগে। সেদিন কণার সাথে জ্যাকসন হাইটসে গিয়েছি ইফতারি কিনতে। আমি গাড়িতেই বসে আছি মুখে মাস্ক পরিহিত। যানবাহন, রেস্টুরেন্ট, মেডিকেল কিংবা কোনো জনবহুল অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র মাস্ক পরা হয়। কিন্তু জ্যাকসন হাইটসে বাঙালিরা মাস্ক পরে থাকে এখনো। আমিও মাস্ক পরে গাড়িতেই বসে আছি। আমি গাড়ি থেকে নামছি না। কারণ নামলেই বাঙালি ভাইদের সাথে দেখা হবে। তাদের নানা রকম প্রশ্ন। কতদিন থাকবেন নিউইয়র্কে? এখন আপনার শরীরের অবস্থা কেমন? ঢাকায় কবে ফিরবেন? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার একদম ভালো লাগে না। তাই গাড়িতেই বসে আছি। তাকিয়ে দেখি পথে সাজানো একটা খেলনার দোকান। যদিও আমার নাতি নাতনি এখন ঢাকায়। কার জন্য খেলনা কিনব? তবু খেলনাগুলো দেখার লোভে গাড়ি থেকে নামলাম। মধ্যবয়স্ক এক লোক। খেলনার পসরা সাজিয়ে বসেছেন। সামনে গিয়ে একটা খেলনা হাতে নিলাম। কী আশ্চর্য! হাতে নিতেই খেলনাটি সঙ্গে সঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেল। লোকটা তখন হা হা করে উঠল।

করলেন কি ভাই? বাচ্চাদের খেলনা। সাবধানে ধরতে হয়। ভেঙে ফেললেন আপনি?

আমি খানিক ইতস্তত বোধ করলাম। লোকটা তখন বলল,

এটার দাম দশ ডলার।

পাঁচ ডলারে শেষ পর্যন্ত রফা হলো। কয়েকদিন পরে আবার গিয়েছি জ্যাকসন হাইটসে। আমি গাড়িতেই বসে আছি। মুখে মাস্ক পরা। আজ আমি মাস্কটা পরেই গাড়িতে বসে আছি। লোকটা আমার সামনে এল। কাতর কণ্ঠে বলল,

একটা খেলনা নিয়ে যান ভাই।

আমি বললাম, কতদিন ধরে এসব বিক্রি করেন? দেশে যান না কেন?

গভীরভাবে লোকটা বলল,

অনেকদিন ধরে ক্যানসার ধরা পড়েছে। এখানে চিকিৎসা চলছে। বিনামূল্যে চিকিৎসা। এইজন্যে দেশে আর ফেরা হয় না। বিকেলে এখানে আসি। খুব কষ্ট হয়। হেঁটে হেঁটে আসি।

কিন্তু কোনো সমিতি নাই? যারা আপনাকে সাহায্য করবে।

না ভাই। কোথায় কে কাকে সাহায্য করে বলুন? নামেন না স্যার গাড়ি থেকে। অনেক খেলনা আছে স্যার?

মাস্ক খুলে আমি গাড়ি থেকে নামলাম। লোকটা তখন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে বলল,

স্যার আপনি শাইখ সিরাজ না? আপনি চ্যানেল আইয়ের না?

হ্যাঁ। আমি সাগর।

ওহো ফরিদুর রেজা সাগর। আপনি তৃতীয় মাত্রা করেন। কত অনুষ্ঠান আপনার। আমি খুব অন্যায় করে ফেলেছি। খুব অন্যায়।

না, না। কোনো অন্যায় না।

না স্যার। খুব অন্যায়।

বলে লোকটা বলল, এই খেলনাটা কিন্তু এমনি এমনি দু টুকরো হয়ে যায়। ঐ পাঁচ ডলার ফেরত দেব স্যার।

আরে না না। ফেরত দিতে হবে না। আমি তো নতুন খেলনা কিনতে চাই।

ঐ টাকার বিনিময়ে নতুন খেলনা নিয়ে যান স্যার। বাচ্চাদের উপহার দিবেন।

আমি লোকটার হাতে আরও দশ ডলার দিলাম।

এটা এমনি দিলাম। এটা রাখেন।

লোকটার চোখ ছলছল হয়ে উঠল।

স্যার, বিদেশে কত কষ্ট। কেউ জানে না। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য এইসব করি। এগুলো কি অন্যায়? এই অন্যায় মানে কি কোনো পাপ?

ন্যায় অন্যায় বিচার করার আমি কে?

লোকটা তখন আমাকে বলতে লাগল,

না, এসব জালিয়াতি আর করব না। আমার কাছে বাংলাদেশের ছোটো ছোটো পতাকা আছে। আমি এখন থেকে পতাকা বিক্রি করব। যে কাজে দেশের সম্মান ও গৌরব বাড়ে সে কাজে কোনো অন্যায় থাকে না।

বলে লোকটা হাতে একটা বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরল। আমি মুগ্ধ নয়নে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ■

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই টেলিভিশন

রবীন্দ্রনাথ

আহসানুল হক

বুকের ভেতর আলো ছড়ান
দুঃখ -কালো সবই তাড়ান
দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ান
মনের ভেতর যত অসুর
দুষ্ট রিপু, হিংস্র পশুর
সব করে দেন দূর–
দেখতে যেন দাদুর ছবি
তিনি হলেন বিশ্বকবি
কাব্যাকাশের উজল রবি
তিনি ‘রবি ঠাকুর’ !

সাম্যের বাঁশি

নীলিমা শীল

সাম্যের কবি দ্রোহের কবি
প্রেমের কবি তুমি
তোমার গানে সুরের মানুষ
পেল নতুন ভূমি।

তুমি শেখাও কেউ ছোটো নয়
সকল মানুষ বড়ো,
জাতিকুলের গর্ব ভুলে
সুন্দরের পথ ধরো।

উঁচুনীচুর বিভেদ ভুলতে
বললে তুমি কবি
তোমার চোখে সবাই সমান
আঁকলে মিলন ছবি।

অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ
ফেললে ছুঁড়ে দূরে
প্রেম-প্রীতি সাম্যের বাঁশি
বাজাও মধুর সুরে।
সাহিত্যে সেই অমর নাম
কাজী নজরুল ইসলাম
তোমার লেখায় আমরা সবাই
মানুষের জয় শিখলাম।

মা তোমাকে মনে পড়ে

আমীরুল ইসলাম

রাতে হঠাৎ হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়। বালিশে মাথা রেখে এপাশ ওপাশ করি। উঠে একটু পানি খাই। কিন্তু আর ঘুম আসতে চায় না। যত বয়স বাড়ছে তত এসব হচ্ছে। নির্ঘুম রাত্রি আমার জীবনে নেই। আজকাল হঠাৎ হঠাৎ মাঝরাত পর্যন্ত ঘুম আসে না।

তখন খুব অস্বস্তি হয়।

কোথায় ঘুমের বাড়ি?

ঘুমকে কোথায় পাব?

ঘুম কিনতে পাওয়া যায় কোথায়?

এইসব ভাবতে ভাবতে হয়ত আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ছোটোবেলায় মা বলতেন

আয় ঘুম আয়

আমার খোকার চোখে আয়।

মা আদর দিতেন। আমার চোখেও ঘুম তখন নীলাঞ্জন মেখে দিত। মায়ের কোলে ছোট্ট শিশু আমি ঘুমিয়ে থাকতাম পরম নির্ভরতায়। মায়ের মতো এই স্নেহ কে দেবে আমাকে?

কে দেবে মায়ের মতো ভালোবাসা?

ঘুম তোমাকে কোথায় পাওয়া যায়?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করছি। ভালো লাগছে না। মন খুব খারাপ হয়ে যায়।

মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। ঘুম না এলে মাকে বড়ো মনে পড়ে।

কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না।

যত বয়স বাড়ে তত ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে। আহারে ছেলেবেলা।

আহারে ছেলেবেলা!
আর পুরোটা ছেলেবেলা জুড়ে থাকে মায়ের গল্প।
মায়ের স্মৃতি। মায়ের মধুমাখা আদর।
মাঝরাতে ঘুম ভাঙলেই মায়ের কথা মনে পড়ে।
মা মা ডাক দেই। ফটোফ্রেমের মধ্যে মায়ের হাসিমুখ।
মা কি আমার কথা শুনতে পারে? মা কি আমার আকুলতা টের পায়?
জানি না। তবে প্রচলিত আছে আমরা যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সে কিন্তু বিভিন্ন ছলনায় ধরা দেবে। তাই এই মাঝরাতেও মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়।
মা আমাকে দেখে বললেন–
বাবা তোর চুলগুলো অনেক বড়ো হয়ে গেছে। চুল কাটিস না কেন?
কেমন বুনো চেহারা হয়েছে তোমার?
চুল দাঁড়ি হাত পায়ের নখ এসব কাটতে হয় বাবা।
তারপর তুই কেমন আছিস?
ভালো আছি মা
খুব ভালো আছি আল্লাহর রহমতে।
আর হ্যাঁ
মাগো তুমি থাকো আমার সাথে সারাক্ষণ
মা আনন্দে হাসলেন।
কী যে পাগল ছেলে তুই।
মা বললেন, বিয়ে টিয়ে করলি না।
শেষ জীবনটা কেমন কাটবে তোর? তাই নিয়ে খুব চিন্তা হয় আমার ।
একদম চিন্তা করবেন না মা।
আপনি তো শিখিয়েছেন যার কেউ নেই তার সবাই আছে। তাই ভয় পাবেন না। একদম দুশ্চিন্তা করবেন না।
মা শুনে আশ্বস্ত হলেন।
তবুও বললেন
মায়ের মন বাবা। বুঝলি না? মায়ের মন সারাক্ষণ মন দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে। সন্তানের মঙ্গল কামনাই তার ধ্যান জ্ঞান।
মা বললেন
তোর লেখালেখির খবর কি?
মা বড়ো লেখক হতে পারিনি।
এখনো লেখালেখি করি। প্রতি বছর আমার অনেকগুলো বই বের হয়। আমি আপনাকে নিয়েও অনেকগুলো বই লিখেছি। আপনাকে নিয়ে সত্য গল্প লিখেছি।
বইগুলো যখন দেখি তখন আনন্দে মন ভরে যায়। মা আরেকটি কথা আমি যেদিন ১৯৮৪ সালে কৈশোর উত্তীর্ণ বয়সে অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার পাই, সেদিন আপনি বলেছিলেন
যেদিন বাংলা একাডেমি পুরস্কার পাবা সেদিন বুঝব তুমি লেখক হয়েছ।
মা জেনে খুশি হবেন অনেক আগেই আমি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছি। পাওয়ার পর বুঝতে পারলাম এই পুরস্কার আসলে মহার্ঘ কিছু নয়। লেখক হতে হলে অনেক রক্তঘাম ঝরাতে হয়। সোনা পুড়ে পুড়ে খাঁটি লেখক হতে হয়।
লেখালেখি ছাড়িনি মা।
রাতে যখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তখন লিখতে বসি। আর নীরব নিশ্চুপ পরিবেশে লিখতে গিয়ে বারবার আপনাকে মনে পড়ে।
আপনি উৎসাহ না দিলে আমি কি লেখালেখি করতে পারতাম? মনে হয় না। হয়ত অন্য আমীরুল তৈরি হতো। আমার জীবনের ভিডিওটা আপনার প্রভাবে তৈরি হয়েছে। আপনি আমাকে খুব ভালো বুঝতে পারেন। আমার হাঁটার শব্দ শুনলেই আপনি টের পেতেন টুলু মিয়া আসছে।
আপনি বাড়তি ন্যাকামি একেবারে পছন্দ করেন না। কারণ আপনি ধরেই নিতেন আপনার সন্তানেরা অনেক পরিশীলিত। তাদের বিবেচনাবোধ অনেক। তারা অনেক মেধাবী। তাই সন্তানদের মতামত আপনার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।
রাতে ঘুম ভেঙে যায়। আপনার কথা মনে করে। কেন এমন হয়?
মনে হয় আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।
আপনি আমার সঙ্গেই সবসময় থাকেন। আপনাকে খুব মনে পড়ে মা। অনেকদিন হলো আপনাকে দেখি না। আপনার কথা শুনি না।
মা কবে দেখা হবে আপনার সঙ্গে?
আপনার জন্য দোয়া করি সব সময়। আপনি ভালো থাকবেন। অনেক শুভ কামনা। ■

কবি ও শিশু সাহিত্যিক

গল্প

মা তোর বদনখানি মলিন হলে

নাসরীন মুস্তাফা

বদন মানে কি, তা আমি জানতাম না।
বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে আছে এরকম কথা- মা তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন জলে ভাসি! আমার সব কথা তো মায়ের সাথেই। মা আমাকে বুকের সাথে টেনে নিলেন। সারা মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, এই যে বদন! চাঁদের মতো বদন আমার সোনামানিকের।
বুঝলাম, বদন মানে মুখ।
মলিন মানে কী?
মন খারাপ থাকলে মুখটা ঝলমলে লাগে না। মলিন লাগে। কালচে হয়ে যায়। দেখলেই বোঝা যায়, মন খারাপ।
বুঝলাম। মন খারাপ থাকলে বদনখানি মলিন হয়। আর তখনি বুঝি নয়নজলে ভাসতে হয়, মা?
নয়ন মানে চোখ রে সোনা। মন খারাপ ভাবটা খুব বেশি হলে চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে। অনেক বেশি পানি এসে মুখটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মা এত কথা বলার পর আমি হাত দিয়ে মায়ের বদন ছুঁয়ে দিই। বুঝতে পারছি, আমার মায়ের বদনখানি মলিন এখন। আমার হাত ভিজে গেছে কি? না, ভেজেনি। মায়ের মুখটা মলিন হলেও নয়নজলে ভাসেনি। কখনোই ভাসে না। আমার ভাবতেই অবাক লাগে। কেন আমার মায়ের চোখের পানি গালে গড়িয়ে পড়ে না? আমি তো কখনো পড়তে দেখিনি। এই যাহ্! এ আমি কি বলে ফেললাম? আমি কি কখনো দেখেছি কিছু? আমার বাম চোখে আলোর খানিক আভাস টের পাই। কিন্তু ডান চোখে তো একদম আঁধার। কোলে থাকার সময়ই মা টের পেয়েছিলেন সমস্যাটি। ডাক্তার বলেছিলেন, সমস্যা হয়েছিল মায়ের পেটে থাকতেই। একটু একটু করে আমার শরীর তৈরি হচ্ছিল, তখনি। চোখ তৈরি হলো কিন্তু ঠিক মত হলো না।
বুঝিয়ে বলি। চোখের পর্দায় কোনো ছবি পড়ার পর চোখ থেকে সে খবর মস্তিষ্কে নিয়ে যায় বিশেষ এক ধরনের স্নায়ু। মস্তিষ্ক তখন দেখার অনুভূতি দেয়। আমার চোখ থেকে মস্তিষ্কে 'দেখার' খবরটা নিয়ে যাওয়ার মতো কাজের কোনো স্নায়ু তৈরি হয়নি। তাই আমি দেখার অনুভূতি টের পাই না।
আমি অন্ধ।

মা আমার চোখ হয়ে থাকলেন আমার সাথে। এই দুনিয়াতে আমি দিব্যি ঘুরে বেড়াই। দিব্যি স্কুলে যাই। হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বই পড়ি। আনন্দ করি।
এভাবেই দিন যাচ্ছিল আমাদের। আমার চোখের সমস্যা সারিয়ে তোলার জন্য মা কেবলি ছুটে বেড়ান। কত কত ডাক্তারের কাছে যে যাওয়া হলো! কাজ কিছু

হলো না। আমি যত বলি, দরকার নেই। আমি তো বেশ আছি। মা আমার শুনলে তো!

এরকম সময়ে মা খোঁজ পেলেন উপায় একটা আছে। কোনো এক প্রতিষ্ঠান নাকি আছে, যারা প্রযুক্তির সাহায্যে অন্ধ চোখেও আলো ফোটাতে পারে। মা কেবলি এসব নিয়ে কথা বলতেন। আমি কিছুই বলতাম না। তবে না বলে আর কতদিন! মা যে কী পাগলামি শুরু করলেন! অফিস থেকে ধার নিলেন। বাড়িটাও বিক্রি করলেন। আমি কথা শুনে বুঝতে পারলাম, আরো অনেক টাকা লাগবে। অনেক অনেক টাকা।

মা-এর সাথে আমার বকাবকি শুরু হলো। আমি যত বোঝাতে চাই, মা কেবলি হাসেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকেন হা হা করে। আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো মা আমার পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

আসলেই মা পাগল হয়ে গেলেন। পাগল না হলে কেউ কি নিজের কিডনি-চোখ এমনকি পুরো শরীরটা বিক্রি করতে চান? আমার মা চাইলেন। তার পাগলামি দেখে পাগল হয়ে গেলেন আরো অনেক মানুষ। বিরাট কাগজে কি সব লিখে তারা নাকি রাস্তায় দাঁড়ালেন। সোস্যাল সাইটগুলোতে কি সব লিখে পোস্ট করলেন। টিভির খবর তো আমি কানে শুনতে পাই। যা শুনছিলাম, তা শুনে আমার মনে হলো আমাকেও পাগল হতে হবে হয়ত।

আমার পাগল হয়ে যাওয়ার আগেই মা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। টাকা জোগাড় হয়ে গেছে। নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে আমি নাকি দেখতে পাব।

ই-সাইট নাম সেই প্রযুক্তিটির। ইলেকট্রনিক চশমার সাহায্যে মস্তিষ্কে দেখার অনুভূতি তৈরি করা হবে। ইলেকট্রনিক সেই চশমা পরেছিলাম। মা বললেন, চশমাটা নাকি অদ্ভুত দেখতে আর তাতে আমাকে নাকি মজাদার দেখাচ্ছে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম বলে মা আমার পাশেই বসে ছিলেন। এক সময় আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কিছু একটা ঘটছে।

আমার চারপাশে জেগে উঠছে দৃশ্যরা। আমার বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। আমার শরীর কাঁপছে। আমার হাত সব সময়ের মতো মায়ের হাত ধরতে চাইল। আমার হাত ধরে ফেলল আরেকটা হাত, আমি খুব অবাক হয়ে সেই হাত আর হাতের মানুষটাকে দেখতে গিয়ে দেখে ফেললাম তাকে। আমার মা-কে।

তাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি। আমি চেঁচিয়ে বললাম, ওহ! মা! তুমি!

মা কিছু বলছিলেন না। আমার হাত চেপে ধরে থাকা তার হাত কাঁপছিল। আমি মায়ের মুখ দেখি। মায়ের চোখ দেখি। বারো বছর বয়সে এসে আমি দেখতে পেলাম, আমার মায়ের মুখ। কী সুন্দর! এত সুন্দর কারো মুখ হয়, জানা তো ছিল না। আমি মুগ্ধ হয়ে বললাম, তুমি এত সুন্দর, মা!

নয়নভাসা জল আমার মায়ের বদন ভিজিয়ে দিচ্ছে, দেখতে পেলাম। হাত ভিজে গেল মায়ের গালে হাত রাখতে। আমি খুব অবাক হয়ে বললাম, তোমার কি মন খারাপ? তোমার বদনখানি মলিন না কি মা? তা না হলে নয়নজলে ভাসছ কেন তুমি?

এই প্রশ্নের জবাব মা দিতে পারলেন না। কেবিল কাঁদতে লাগলেন।

[ক্রিস্টোফার ওয়ার্ড জুনিয়র নামের এক আমেরিকান কিশোরের জীবনের গল্প এটি। বারো বছরের অন্ধ ছেলেটি ইলেকট্রনিক চশমার সাহায্যে মায়ের মুখটা প্রথম দেখেছিল। ওর চোখে দেখার আনন্দ ফুটিয়ে তোলার জন্য ওর মায়ের যুদ্ধের কাহিনি পড়ে মনে হয়েছিল, কেবল মাত্র মা-ই পারেন বুঝি এরকম পাগলামি করতে। মা আসলে এক যোদ্ধার নাম। মা দিবসে ক্রিস্টোফারের মা-সহ পৃথিবীর সব মা-কে সশ্রদ্ধ সালাম, যাঁরা সন্তানের জন্য কেবলি যুদ্ধ করছেন, করে যাবেন।] ■

শিশু সাহিত্যিক

আমার মা

সায়মা আদিবা আভা

আমার মা,
মায়ের মতো নয়নমণি
পৃথিবীতে হয় না।
মা যে আমার
জীবন,
মা যে আমার
প্রাণ,
মা ছাড়া জীবন যে আর
সম্পন্ন হয় না।

৩য় শ্রেণি আইডিয়াল প্রিপারেটরি অ্যান্ড হাই স্কুল, শেরপুর

গল্প

রাতিনের লাল ঘুড়ি

রফিকুল নাজিম

রোদের উত্তাপ ভীষণ। ধূলো উড়া পথঘাট। খটখটে মাঠ। গ্রামের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে সোনাই নদী। বোশেখ মাসে সোনাই নদী আরো ছোটো হয়ে আসে। চৈত্রের খরায় জলও কমে যায়। মানুষজন হেঁটে হেঁটে নদী পার হয়। অথচ বর্ষায় এই নদীতে বানের জল ডাকে। ঘোলাজল গড়িয়ে যায় অনেক দূরের পথ।

সোনাই নদীর দুই তীরে দুটো গ্রাম। উত্তরে কুটানিয়া আর দক্ষিণে মনতলা। রাতিনদের গ্রামের নাম- মনতলা। দারুণ সবুজ শ্যামল এক গ্রাম। কৃষি প্রধান এই গ্রামে সবাই মিলে মিশে বসবাস করে। সবাই

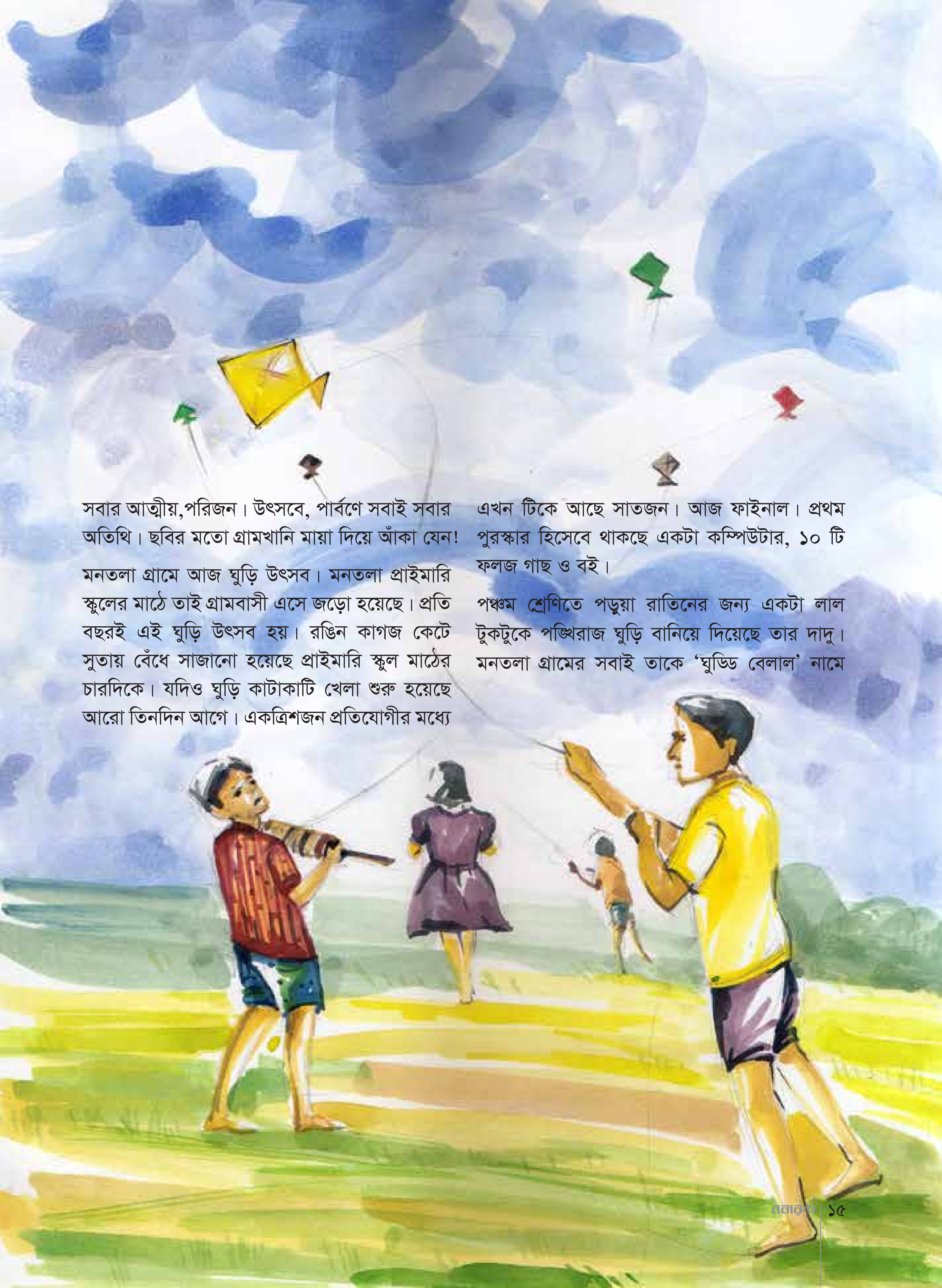

সবার আত্মীয়,পরিজন। উৎসবে, পার্বণে সবাই সবার অতিথি। ছবির মতো গ্রামখানি মায়া দিয়ে আঁকা যেন!

মনতলা গ্রামে আজ ঘুড়ি উৎসব। মনতলা প্রাইমারি স্কুলের মাঠে তাই গ্রামবাসী এসে জড়ো হয়েছে। প্রতি বছরই এই ঘুড়ি উৎসব হয়। রঙিন কাগজ কেটে সুতায় বেঁধে সাজানো হয়েছে প্রাইমারি স্কুল মাঠের চারদিকে। যদিও ঘুড়ি কাটাকাটি খেলা শুরু হয়েছে আরো তিনদিন আগে। একত্রিশজন প্রতিযোগীর মধ্যে এখন টিকে আছে সাতজন। আজ ফাইনাল। প্রথম পুরস্কার হিসেবে থাকছে একটা কম্পিউটার, ১০ টি ফলজ গাছ ও বই।

পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া রাতিনের জন্য একটা লাল টুকটুকে পঙ্খিরাজ ঘুড়ি বানিয়ে দিয়েছে তার দাদু। মনতলা গ্রামের সবাই তাকে ‘ঘুড্ডি বেলাল’ নামে

চিনে। বেলাল দাদু নানান রকম ঘুড়ি বানাতে পারেন। রাতিনের ঘুড়িটা দারুণ হয়েছে। বেশ টেকসই ও শক্তিশালী। রাতিনের বাবা আসগর আলী নিজ হাতে ঘুড়ির সুতায় কাচের পাউডার ও গাবের কষ পেস্ট করেছেন। যেন সুতাটা ধারালো হয়! কোনো ঘুড়ির সুতায়ও যদি রাতিনের ঘুড়ির সুতা চুমু খায়; তবে সেই ঘুড়ির দম শেষ। গোত্তা খেতে খেতে মাটিই শেষ গন্তব্য! প্রাইমারি স্কুল মাঠের আকাশে রং-বেরঙের ঘুড়ি ওড়ছে। পইপই করে উড়ছে সাতটি ঘুড়ি। সাতজন প্রতিযোগীর হাতেই লাটাই। দারুণ কৌশলে ঘুড়ি উড়াতে হয়। রাতিনকে দেখে মনে হচ্ছে সে আরো বেশি সতর্ক। একে একে তিনটি ঘুড়ির সুতা কেটেছে রাতিন। দারুণ দক্ষতায় সে নাটাই ঘুরায়।

রাতিনের শক্ত প্রতিপক্ষ জামিল। কুটানিয়া গ্রাম থেকে সে এসেছে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। দুর্দান্ত তার হাতের কাজ! ঘুড়ি যেন বশ মেনেই উড়ে! খেলা চলছে। একবার রাতিন এগিয়ে যায় জামিলের ঘুড়ির দিকে। আবার জামিল বীরের বেশে এগিয়ে আসে রাতিনের পঙ্খিরাজ ঘুড়ির কাছে। সাপের মতো জড়িয়ে গেছে দুই ঘুড়ির সুতা। রাতিনও কৌশল করে নাটাই চালাচ্ছে। জামিলও কম যায় না। উপস্থিত গ্রামবাসী হা করে তাকিয়ে আছে ঘুড়ি দুটোর দিকে। যেন সবাই দম আটকে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। হঠাৎ-ই রাতিন নাটাই ধরে টান দিতেই জামিলের ঘুড়ির সুতা কেটে গেল। সাথে সাথে চারদিকে রাতিন রাতিন স্লোগান দিতে থাকে গ্রামবাসী। রাতিনকে কাঁধে নিয়ে উল্লাস করছে কয়েকজন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে রাতিনের বাবা। ছেলের বিজয়ে আসগর আলী সাহেব খুশিতে তার চোখে জল চলে এসেছে। দূরে গিয়ে তিনি রাতিনকে কাঁধে নিয়ে নাচতে শুরু করেন। রাতিন তাকিয়ে আছে জামিলের সুতা কাটা ঘুড়ির দিকে। দক্ষিণের বাতাসে লুটোপুটি খেতে খেতে ঘুড়িটা উড়ে যাচ্ছে দূরে। বিজয়ী রাতিন আজ ভীষণ খুশি। ■

গল্পকার

প্রকৃতি

ফাহমিদা আক্তার

নীলাকাশে শুভ্র চাঁদ হাসে
মায়াবী আলোয় চারিপাশ ভাসে,

গুনগুন করে পাখি গেয়ে উঠে গান
সাথে ঝরনা ধারার কলতান

নদীর জলে শাপলা-শালুক হাসে
মাঝির গানে নৌকা ভাসে

হাসনাহেনা ফুলে সুবাসিত চারিধার
প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পাই শান্তি অপার

ফড়িঙের মতো মন ছোটে মন
ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ঋতুর আগমন।

৫ম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

নূরী ও ভেড়ার ছানা

জুয়েল আশরাফ

পড়ন্ত বিকেল। আম্রকাননে পাখির গুঞ্জন। সব পাখি নীড়ে ফিরছে। পাঁচ-ছয় বছরের নূরীর পৃথিবীটা মাটি-খড়ের তৈরি একটা কুঁড়েঘর আর বাইরে একটা পেয়ারা গাছের ডালে বাঁধা একটা ঝুপড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নূরী তার মায়ের সঙ্গে বনে যায় কাঠ সংগ্রহ করতে। বাবা পাশের জমিতে ভুট্টা চাষ করে।

একটু আগে নূরী ও তার মা যখন বনে পৌঁছালো, তখন তারা দেখতে পেল একটি ছোটো ভেড়ার বাচ্চা জোরে চিৎকার করছে। ভেড়ার বাচ্চাটি এখান থেকে ওখানে এবং ওখান থেকে এখানে ছুটফট করছে। কেউ ভয় পেলে যে-রকম করে। সম্ভবত বেচারা তার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। নূরীর মা আদর করে ভেড়ার বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিলেন, আদর করলেন, তারপর ভেড়াটি নূরীর মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। নূরী খুশিতে মায়ের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, কখনও পিঠে, কখনও হাততালি দিয়ে আবার কখনও আদর করে ভেড়াটিকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করল। নূরী মাকে বলল, ও কাঁদছে কেন মা? খিদে পেয়েছে? আমি কি আমার বিস্কুট তাকে দেব? তার মা কোথায়? আমরা এটা আমাদের সঙ্গে

নিতে পারি?

নূরীর প্রশ্নের শেষ নেই। মা নূরীকে বললেন, ভেড়াটি মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে, তাই সে এত কাঁদছে।

নূরী বলল, তাহলে আমরা কি এটাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি?

নূরী সঙ্গে সঙ্গে তার পকেট থেকে এক টুকরো বিস্কুট বের করে ভেড়াটিকে খাওয়াতে চাইল। ভেড়াছানাটি মুখ খুলে নূরীর কনিষ্ঠ আঙুলে দিলো কামড়। নূরী চিৎকার করে উঠল– মা, এটা কামড়াতে শুরু করেছে।

মা বললেন, আমি একটু আস্তে ধীরে কোলে রেখেছি। বেচারা ভয় পাবে। আগে একটু যত্ন নিই তারপর ঘাস খাওয়াবো।

নূরী এখন তার ছোটো ছোটো হাত দিয়ে ভেড়ার বাদামি রঙের ছানাকে আদর করতে করতে মনে মনে কী যেন ভাবল। তারপর ছানাকে বলল, কী সুন্দর তুমি, তোমার মা হারিয়ে গেছে? তুমি কেঁদো না, আমার মা আমাদের দুজনেরই। আমাকে কেন কামড় দিলে? তুমি কি একটা থাপ্পড় খাবে? খাবে তুমি একটা থাপ্পড়... আর এখন থেকে তোমার নাম...।

ভেড়ার ছানাটি রেগে আছে। নূরী মাকে বলল, মা, আমরা একে কামড়ানি বলি?

মা ভেড়াটাকে নূরীর হাতে দিয়ে বললেন, তোমার এই বাদামি রঙের ভেড়াটাকে সামলাও, আমি একটু কাঠ বেছে নিই, না হলে সন্ধ্যায় চুলা জ্বলবে না।

নূরী, কামড়ানি এবং মা বাড়ি ফিরে আসে। নূরী জীবন্ত একটি খেলনা বাড়ি বয়ে এনে দারুণ খুশি। সে উৎসাহে বাড়িতে এসে বাবাকে কামড়ানির কথা বলল। বাবা নূরীকে বললেন, তুমি স্কুলে ভর্তি হয়েছ, তুমি স্কুলে গেলে এই ভেড়াটা যাবে কোথায়?

নূরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, কামড়ানিও আমার সঙ্গে স্কুলে যাবে।

অনেক নিষেধ সত্ত্বেও নূরী কামড়ানিকে সঙ্গে করে স্কুলে যায়। মা দুইটি ফিতা তৈরি করলেন। একটি লাল ফিতা ফুল তৈরি করে নূরীকে পরিয়ে দিয়েছেন। পথে নূরী তার চুলের লাল ফিতা খুলে কামড়ানির গলায় পরিয়ে দিলো। স্কুলের দরজায় পৌঁছাতেই সব ছেলে-মেয়ে তাকে ঘিরে ধরে দাঁড়ায়। কিছু ছেলে-মেয়ে হাসল, কেউ কামড়ানিকে আবার কখনও নূরীকে দেখে অবাক হলো। চারপাশে এত ভিড় দেখে নূরীর একবার মনে হলো যেন সে রাজকন্যা আর তার রাজকীয় ঘোড়াটি এই ভেড়ার ছানা। একটা ছেলে মজা করে বলল, কেন ভাই, এই ছাগল এখানে পড়াবে নাকি তুমি?

নূরী গর্ব করে মাথা তুলে বলল, এটা কামড়ানি আর সে আমার সঙ্গে থাকবে, নূরী এবং কামড়ানি। এটি কোনো সাধারণ ভেড়া নয়, এর জাদু আছে। আর এখনও তুমি জানো না এটি কী করতে পারে।

ছেলে-মেয়েরা অবাক হয়ে বলল, সত্যিই নূরী? তোমার কামড়ানি ভেড়া কী করতে পারে?

নূরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, সময় হলে জানাবো।

শিক্ষকদের কাছেও নূরী ঘুরে ঘুরে কিছু গল্প বলল। সে বলল যে, বাড়িতে কেউ না থাকলে বেচারা কামড়ানি একা হয়ে যায়, এটি মাত্রই একটি শিশু ভেড়া, স্যার। কাছাকাছি বন্য কুকুর তাকে খেয়ে ফেলবে। সেজন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

এই বলে নূরী কাঁদতে থাকে। শিক্ষকদের নির্দেশে কামড়ানিকে বাইরে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো। স্কুল ছুটির পর নূরী ও তার বন্ধুরা কামড়ানিকে ঘিরে ফেলল। কেউ তাকে লড্ডু খাওয়ালো, কেউ বাসা থেকে দুধ আনলো, কেউ সবুজ পাতা খাওয়ালো। কামড়ানি সব ছেলে-মেয়েদের খুব ভালোভাবে আনন্দ দিলো। কখনও কারোর সঙ্গে খেলা করল, কখনও কারোর ব্যাগ ফেলে দিলো, কখনও রেগে গেল। ছেলে-মেয়েরা নাচলে কামড়ানিও সামনের দুই পায়ে লাফ দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। কামড়ানি শুধু মজা দেখাতে লাগল। অনেক সময় হেডমাস্টার ক্লাস রুমে এসে জিজ্ঞেস করেন, পড়াশোনা কেমন চলছে?

সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ার ছানাটি সবার সঙ্গে জোরালো গলায় বলে ওঠে, ম্যা... ম্যা... ম্যা।

শিক্ষক হাসতে হাসতে ক্লাসে চলে যান।

বাড়ি ফেরার সময় নূরী প্রতিদিন ক্লাসের সমস্ত জ্ঞান কামড়ানিকে দিতে দিতে হেঁটে যায়, কখনও তাকে টেবিলে বসিয়ে দিয়ে আবৃত্তি শোনায়, কখনও তাকে বর্ণমালা শেখায়। যেমন, ক-তে কদম, খ-তে খরগোশ। তবে ভেড়ার ছানাটি শুধুমাত্র ম্যা... ম্যা করে ওঠে। প্রথম দিন নূরী রাগ করে বলল, তুমি কি সব সময় রেগে থাকো? কামড়ানি তার নিষ্পাপ মুখ তুলে আবার নূরীর দিকে তাকালো। নূরী তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার প্রিয় কামড়ানি, আমি চাই তুমি কথা বলো। আমরা কত বিষয়ে কথা বলি, তাই না?

কামড়ানি শুধু মৃদুস্বরে বলল, ম্যা... ম্যা... ম্যা... হঠাৎ ম্যা-এর পরে, নূরীর মনে হলো যেন কামড়ানি বলেছে 'হ্যাঁ'।

নূরী একটু থেমে তারপর বলল, কামড়ানি তুমি কিছু বললে?

কামড়ানি কিছু না বলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। নূরী পেছন পেছন ছুটতে লাগল। তারপর বলল, কামড়ানি তুমি 'হ্যাঁ' বলেছ তাই না?

নূরী আর কামড়ানি বাড়ি পৌঁছালো। নূরী মনে মনে ভাবছে, কামড়ানি কি সত্যি আজ কিছু বলেছে? আমার মনে হয় বলেছে। এসব ভাবতে ভাবতে রাতে ঘুমিয়ে গেল।

পরের দিন স্কুলে যাওয়ার সময় নূরী আবার বলল, তুমি কি গতকাল সত্যিই 'হ্যাঁ' বলেছিলে, কামড়ানি? আমার মনে হয় তুমি কথা বলেছো, তাই না?

বলতে বলতে নূরী হেঁটে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে একটা আওয়াজ এল 'হ্যাঁ।' নূরী পেছন ফিরে তাকালো। কড়া দৃষ্টিতে তাকালো, থমকে দাঁড়ালো কামড়ানির দিকে। ছুটে এসে কামড়ানিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি জানতাম, আমার কামড়ানিটা অন্যরকম, ছোটোখাটো অন্যরকম নয়, একেবারেই অপূর্ব! আমার কামড়ানি কথা বলতে পারে, বুঝতে পারে এবং খুশিতে নাচতে পারে। আমার কামড়ানি, আমার কামড়, আমার কামড়ানি কথা বলে, আমার কামড়ানি কথা বলেছে!

নূরী খুশিতে নাচল। হঠাৎ কামড়ানি বলল, নূরী, এই গোপন কথা তোমার আর আমার মধ্যেই থাকুক।

নূরী খুশিতে ফুলে উঠল। সে তাড়াহুড়ো করে বলল, হ্যাঁ, কামড়ানি, আমি জানি, আমি জানি।

এভাবেই কেটে গেল অনেকগুলো মাস। বাড়ি থেকে স্কুলে এবং স্কুল থেকে বাড়িতে আসার সময় নূরী আর বাদামি রঙের কামড়ানি কথা বলে। নূরী এখন কথা বলা ভেড়ার সন্ধান ও সঙ্গী পেয়েছে। শুধু তাই নয়, নূরী কামড়ানিকে যখন যা শেখায়, কামড়ানি তখনই তা শিখে যায়।

একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটি ছেলে নূরীকে কামড়ানির সঙ্গে কথা বলতে শুনল, প্রথমে সে বিশ্বাস করতে পারেনি, তারপর সে পরের দিন আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নূরী এবং কামড়ানিকে গোপনে অনুসরণ করল। ছেলেদের বিস্ময়ের সীমা নেই। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, আরে! নূরী ঠিকই বলেছে এটা সাধারণ ভেড়ার বাচ্চা নয়, কথা বলতে পারে।

একটি ছেলের মন বিগড়ে গেল। সে সিদ্ধান্ত নিল, যে-কোনো উপায়ে কামড়ানিকে নেবো। স্কুলে ছুটির কিছুক্ষণ আগে ছেলেটি মাঠে গিয়ে কামড়ানির লাল ফিতাটি খুলল। কামড়ানি ভাবল হয়ত ছেলেটি তার সঙ্গে খেলার চেষ্টা করছে এবং তার পেছনে দৌড়াতে শুরু করবে। স্কুলের সীমানা পার হয়ে গেলে কামড়ানির মনে হলো কিছু একটা হয়েছে, সে জোরে জোরে নূরী... নূরী করতে লাগল। ছেলেটি বলল, কামড়ানি আমি জানি তুমি কথা বলতে পারো। আমি তোমাকে ভালো দামে বিক্রি করে দেব। না, না, আমি বৈশাখি মেলায় তোমার অনুষ্ঠান রাখব এবং টিকিট কেটে অনেক টাকা কামাবো।

কামড়ানি শুধু নূরী... নূরী নূরী চিৎকার করল।

ছুটির পর নূরী দেখল কামড়ানি সেখানে নেই, তাই কাঁদতে কাঁদতে তার অবস্থা খারাপ। কামড়ানি, আমার প্রিয় কামড়ানি কামড়ানি, তুমি কোথায়?

ছেলে-মেয়ে সবাই কামড়ানিকে খুঁজতে বের হলো।

কামড়ানিকে কোথায় পাই? সে অনেক দূরে চলে গেছে।

কাঁদতে কাঁদতে নূরী বাড়িতে পৌঁছে মাকে জড়িয়ে

ধরে অনেক কাঁদল। মা অনেক বুঝিয়ে বললেন, কামড়ানি আসবে, নূরী কেঁদো না। এখন সে পথ চিনে, কোথাও নিশ্চয়ই গেছে ঘাস খেতে।

এবার নূরী মাকে বলল, কেউ চুরি করেছে মা কামড়ানিকে। আমার কামড়ানি কথা বলতে পারে, সত্যি মা। আমরা প্রতিদিন আসতাম অনেক কথা বলতে বলতে। আমি সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো।

মা বিশ্বাস করতে পারলেন না, ভাবলেন হয়ত নূরী হতভম্ব হয়ে এসব বলছে। তবু নূরীর মনটা ধরে রাখতে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ এমনটা হতে পারে। কথা বলতে হয়ত কেউ দেখেছে, তাই চুরি করেছে। কিন্তু দেখো কামড়ানি ফিরে আসবে, দেখো।

নূরীর কান্না থামছে না। তিনদিন স্কুলেও গেল না। কামড়ানি, কামড়ানি ফিরে এসো আমার প্রিয় কামড়ানি...। একথা শুধু বলে চিৎকার করতে থাকে।

হঠাৎ পঞ্চম দিন রাতে নূরীর মনে হলো কেউ তাকে ডাকছে, নূরী... নূরী।

নূরী দৌড়ে দরজা খুলে দেখল কামড়ানি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। নূরী নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, সে কি স্বপ্ন দেখছে? না। জোরে চিৎকার করে বলল, কামড়ানি...।

নূরী দৌড়ে এসে কামড়ানিকে জড়িয়ে ধরে বলল, কামড়ানি কোথায় গিয়েছিলে?

কামড়ানি কান্না জড়ানো গলায় বলল, দেখো আমার কথা কতটা ভারী ছিল। আমি এখন থোকে তোমার সাথে কথা বলব না, দূরেও যাব না।

ভেতর থেকে মা ছুটে এসে বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস?

নূরী বলল, দেখো মা, কামড়ানি এসেছে... আমার কামড়ানি... কামড়ানি।

চিৎকার করতে করতে কামড়ানি নূরীর কোলে ঢুকে গেল। এরপর থেকে কামড়ানি আর কথা বলেনি। ■

শিশু সাহিত্যিক

মজার কবিতা

শিয়াল পেলো সাজা

কবির কাঞ্চন

মুরগি চুরির অপরাধে
শিয়াল পেলো সাজা
ঘণ্টা বেঁধে ঘুরতে হবে
বলল সিংহ রাজা।

এই খবরে বনের ভেতর
চলছে কানাঘুষা
সুযোগ পেয়ে যে সে তারে
দিচ্ছে জোরে ঠুসা।

কক্কুরুক্কু ডেকে ওঠে
মুরগি করে শোকর
বাগে পেয়ে শিয়ালকে সে
জোরসে মারে ঠোকর।

দীর্ঘশ্বাসে শিয়াল বলে
রাজা যদি ছাড়ে
সময়মতো দেখব তোদের
বলবি তখন মা রে।

পুতুল বিয়ে

মাহমুদ রাজু

উঠোন পারে করছে খেলা
অনিক,পারুল,টুটুল
তাদের হাতে ছোট্ট একটি
কালো রঙের পুতুল ।

শাড়ি পরায় চুরি পরায়
সাজায় কালি দিয়ে,
তাদের মাঝে হই পড়েছে
পুতুল বিয়ে নিয়ে ।

দিচ্ছে তারা পুতুল বিয়ে
গাছের পাতার সাথে,
গাছ থেকে যে শুকনো পাতা
পড়েছিল রাতে ।

আমরা যেমন নিজের মতো
নানান মজায় মাতি,
ঠিক তেমনি ছোট্ট পুতুল
ওদের খেলার সাথি ।

শিয়ালের বিয়ে

বিচিত্র কুমার

রৌদ্র বৃষ্টির লুকোচুরি
খেঁকশিয়ালের বিয়ে,
বর এসেছে ঘোড়ায় চড়ে
টোপর মাথায় দিয়ে।

হলদে পাখি হলুদ মাখায়
বর কনের গায়,
ময়না টিয়া শালিক পাখি
বিয়ের গান গায়।

কদম ফুলের বাহারি সাজে
কনের বাড়ির কক্ষ,
বাঘ সিংহ হাতি ভালুকসহ
কত্ত এল বরের পক্ষ।

খেঁকশিয়ালের বিয়ে হলো
বাজল গুড়ুম গুড়ুম বাদ্য,
চেটেপুটে খেলো সবাই
বিয়ে বাড়ির খাদ্য।

ঘাসফড়িং

এম হাবীবুল্লাহ

ঘাসফড়িঙের উড়তে মানা
নেই তো কোনোখানে
ইচ্ছে হলেই ঘুরে বেড়ায়
দূরের ঐ আসমানে।

গাছের পাতার মতো তাদের
সবুজ সবুজ ডানা
পাখপাখালির সাথে তাদের
মিশতে আছে মানা।

সামনে পেলে পাখি তাদের
গ্রাস বানিয়ে ফেলে
ফড়িং ছানা, তাই বলি কী
থাকো বরং জেলে।

কষ্টে কাটুক জেলের জীবন
হয় যদি হোক সাজা
বেঁচে থাকলে মনের রাজ্যে
তুমিই হবে রাজা।

দমকা হাওয়া

রফিক আমিন

দমকা হাওয়ার তালে
ঝমঝমা ঝম বৃষ্টি
মাঠ ঘাটে পানি জমে
করে যে অনাসৃষ্টি

মাছ ধরছে দিন-রাত
জেলেদের দল
বর্ষার ঘোলা জল
চলছে কলকল

জোনাকিরা মেলা বসায়
আলো আর আঁধারে
ব্যাঙ ডাকে একাধারে
বন আর বাদাড়ে

টুনটুনি

হাসু কবির

ছোট্ট পাখি টুনটুনি
টুন টুন সুরে গায়
সারাদিন ঘুরে ফিরে
কীটপতঙ্গ খায়।
দুটি পাতা জোড়া দিয়ে
বাসা বুনে নিজে নিজে
সাথি নিয়ে বাস করে
রোদ বৃষ্টিতে ভিজে।
ডিম পাড়ে তিন চার
নীলচে রং যে তার
বাচ্চা ফুটতে লাগে
বারো তেরো দিন যার।
বাড়ির আঙিনাতে
যদি থাকে ঝোপঝাড়
সেখানেই বাসা বেঁধে
জীবনটা করে পার।

অহংকারী ছিপ

মুহাম্মাদ বিহাম

এক ছিল ছিপ। ছিপটা ছিল বিশাল বড়ো। তার মালিক তাকে নিয়ে মাছ ধরত। ছিপটাতে খুব বড়ো বড়ো মাছ উঠত। তাই ছিপটার খুব অহংকার।

একদিন নদীতে মাছ ধরতে গেল তার মালিক। সেখানে গিয়ে দেখে আরো অনেক মানুষ মাছ ধরছে। সবার হাতেই ছোটো ছোটো ছিপ। আর ছোটো ছিপে মাছ ওঠেও ছোটো ছোটো। তাই বড়ো ছিপটা হেসে বলল, তোমরা তো ছোটো ছোটো মাছ ধরো। আমাকে দেখো, আমি কত বড়ো! তাই মাছও ধরি বড়ো বড়ো। এ কথা শুনে ছোটো ছিপেরা খুব কষ্ট পেল। আর বলল, অহংকার করতে হয় না। অহংকার করা ভালো না।

কিছুক্ষণ পর বড়ো ছিপে বিশাল বড়ো একটা মাছ ধরল। মাছটা ওঠানোর অনেক চেষ্টা করা হলো। কোনোভাবেই মাছটা ওঠানো গেল না। এক সময় ছিপটা মড়মড় করে ভেঙে গেল। ছোটো ছিপেরা বুঝতে পারল যে ছোটো থাকাই ভালো। কারণ ছোটো ছিপে মাছও ওঠে ছোটো ছোটো । আর ছোটো মাছ উঠলে ছিপও ভাঙে না। ছোটো মাছ ধরার মজাই আলাদা।

তার মানে আমরা বুঝলাম– অহংকার করা ভালো না। অহংকার করলে পতন আসবেই। ■

৬ষ্ঠ শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

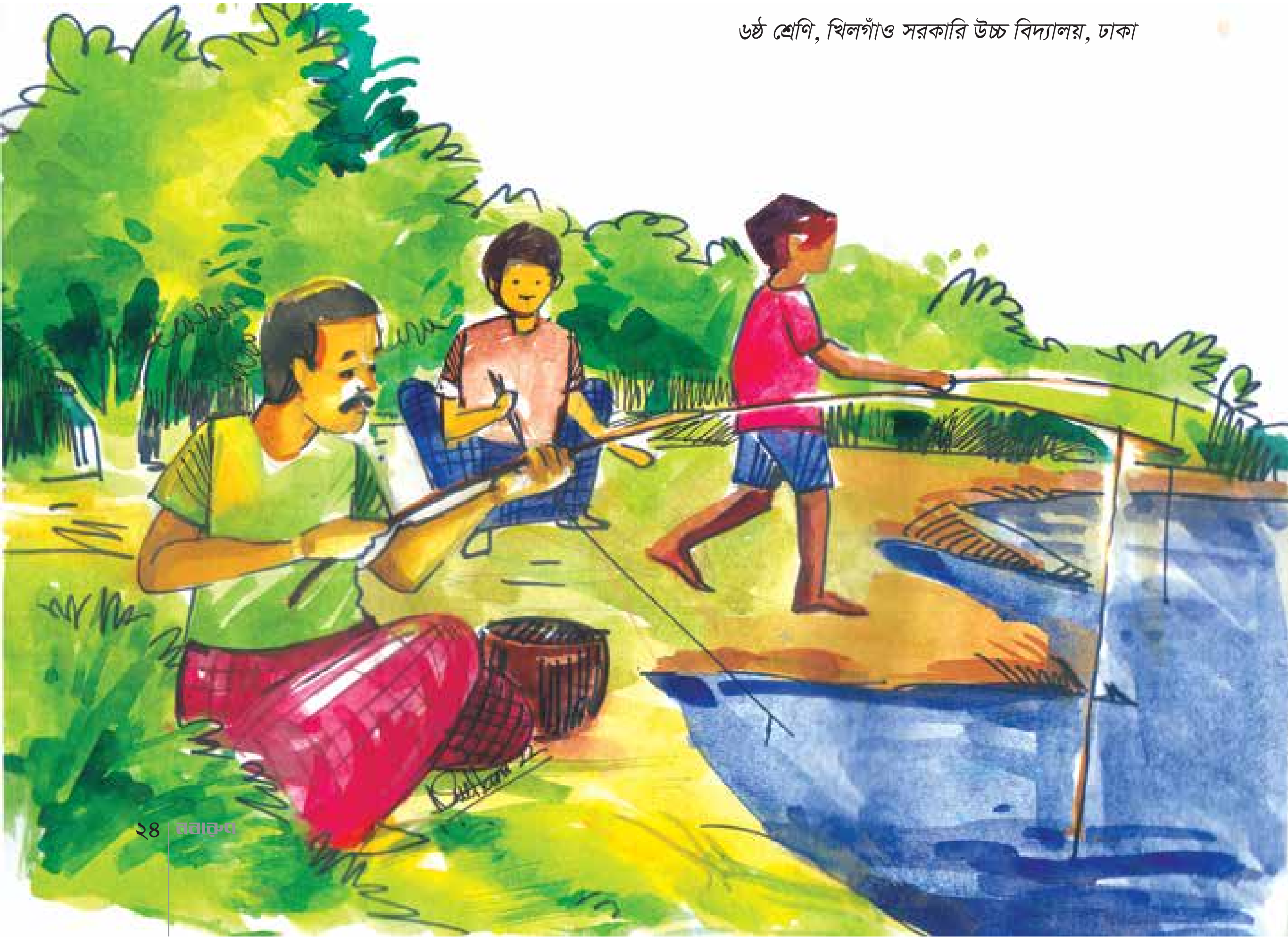

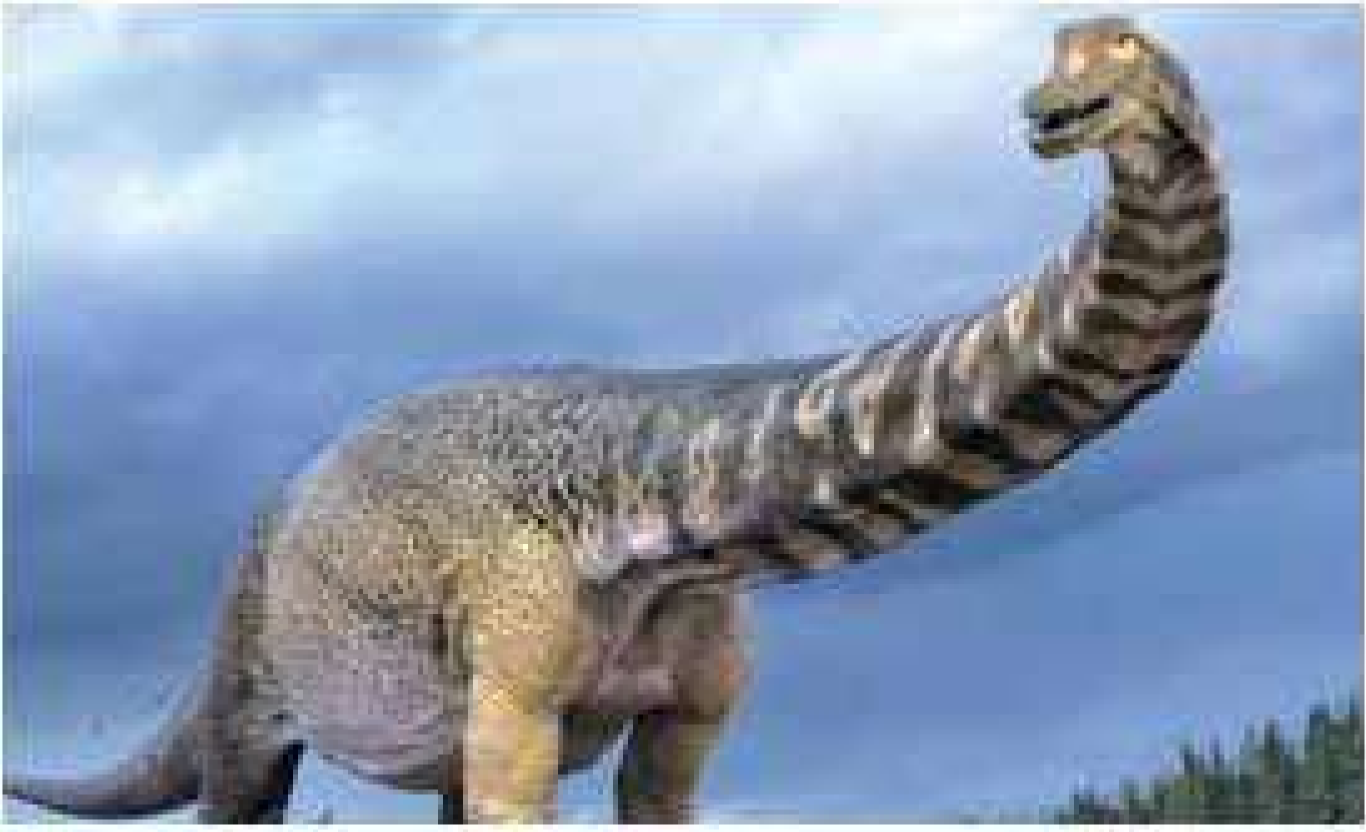

বিচিত্র কিছু ডাইনোসর

শামস্ নূর

কোটি কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ডাইনোসর সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের কমতি নেই। ডাইনোসর নিয়ে যতই গবেষণা হচ্ছে নতুন নতুন অনেক তথ্য আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে। বন্ধুরা, এ প্রাণী সম্পর্কে তোমরা অনেক কিছু জানো তবুও গবেষণার নতুন তথ্য তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম–

বিশ্বের বৃহত্তম ডাইনোসর

ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছে বহু বছর আগেই। তবে এই ডাইনোসর নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। নানা তথ্যও মিলছে ডাইনোসরের।

গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা ডাইনোসরের নতুন একটি প্রজাতি তালিকাভুক্ত করেছেন। ২০০৭ সালে কুইন্সল্যান্ডে একটি ডাইনোসরের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন তাঁরা। দীর্ঘ গবেষণার পর তাঁরা বলছেন, এই মহাদেশে খোঁজ পাওয়া বৃহত্তম ডাইনোসর প্রজাতিগুলোর একটি ছিল এই ডাইনোসর।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ডাইনোসরের নতুন প্রজাতির নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালোটাইটান কুপারেনসিস বা দ্য সাউদার্ন টাইটান। গবেষকেরা বলছেন, অস্ট্রেলিয়ায় খোঁজ পাওয়া এই ডাইনোসর বিশ্ব জুড়ে খোঁজ পাওয়া বৃহত্তম ১৫ ডাইনোসরের একটি। এর আকার একটি বাস্কেটবল কোর্টের সমান। অর্থাৎ এর উচ্চতা সাড়ে ছয় মিটার (প্রায় ২১ ফুট) ও দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার (প্রায় ৯৮ ফুট) হতে পারে।

কুইন্সল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রথম এই প্রজাতির কঙ্কাল পাওয়া যায়। প্যালেওন্টোলজিস্টরা গত দশক থেকে ডাইনোসরের প্রজাতি শনাক্ত করতে কাজ করছেন। তাঁরা অন্যান্য জানা প্রজাতির সাওরোপডসের সঙ্গে হাড়ের স্ক্যান করে তা তুলনা করেন।

সাওরোপডস মূলত তৃণভোজী ডাইনোসর এবং এদের আকারের জন্য এরা বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। এর মাথা ছোটো, ঘাড় ও লেজ দীর্ঘ এবং পা পিলারের মতো মোটা ছিল। ৯ কোটি ২০ লাখ থেকে ৯ কোটি ৬০ লাখ বছর আগে ক্রিটাসিয়াস যুগে এই ডাইনোসরগুলো অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে দাপিয়ে বেড়াত।

অস্ট্রেলিয়ার গবেষক দল নতুন আবিষ্কার করা ডাইনোসরকে কুপার নামে ডাকত। কুপার ক্রিকের কাছে এর কঙ্কাল পাওয়ার কারণে এমন নাম দেওয়া হয়। গবেষকেরা বলছেন, কঙ্কালের অবস্থান, এর আকার ও ভঙ্গুর অবস্থার কারণে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় লেগেছে।

গবেষকেরা জানান, অস্ট্রালোটাইটান নামের এই ডাইনোসরের অন্যান্য সাওরোপডসের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। গবেষক স্কট হকনাল বলেন,'দেখে মনে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম ডাইনোসররা একটি বড়ো সুখী পরিবারের অংশ ছিল।' কুইন্সল্যান্ড রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নতুন ডাইনোসর প্রজাতি নির্ধারণকে স্বাগত জানিয়েছে।

২০ কোটি বছর আগের ডাইনোসরের পায়ের ছাপ

যুক্তরাজ্যের ওয়েলসের পেনার্থ সমুদ্রসৈকতে ডাইনোসরের পায়ের ছাপের সন্ধান মিলেছে। ছাপগুলো ২০ কোটি বছরের বেশি পুরোনো বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পায়ের ছাপগুলো ট্রায়াসিক যুগের বলে মনে করছেন লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের জীবাশ্মবিদেরা। তাঁদের ধারণা, এগুলো সাওরোপড বা এই গোত্রভুক্ত ডাইনোসর। পৃথিবীর বুকে চরে বেড়ানো প্রথম দিকের ডাইনোসর ছিল সাওরোপড।

এ নিয়ে মিউজিয়ামটির জীবাশ্মবিদ সুসানা মেইডমেন্ট বলেন, ট্রায়াসিক যুগে ব্রিটেনে সারোপড গোত্রের প্রথম দিকের ডাইনোসরের বসবাস ছিল। আগেও দেশটির সমারসেট এলাকায় ক্যামেটোলিয়ার হাড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্যামেটোলিয়া সাওরোপড গোত্রের একেবারে প্রাথমিক দিকের ডাইনোসর।

ডাইনোসরের প্রাচীন এই পায়ের ছাপগুলো খুঁজে

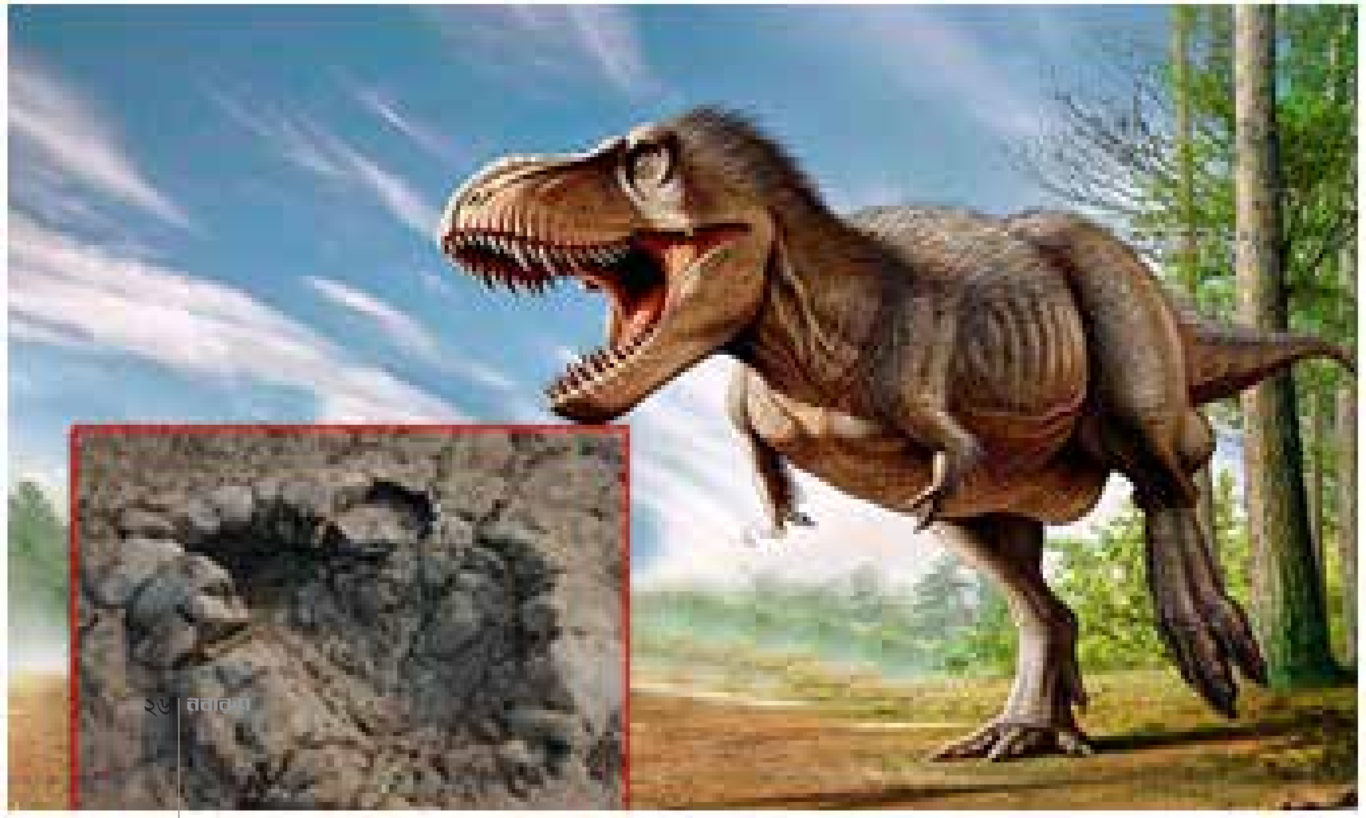

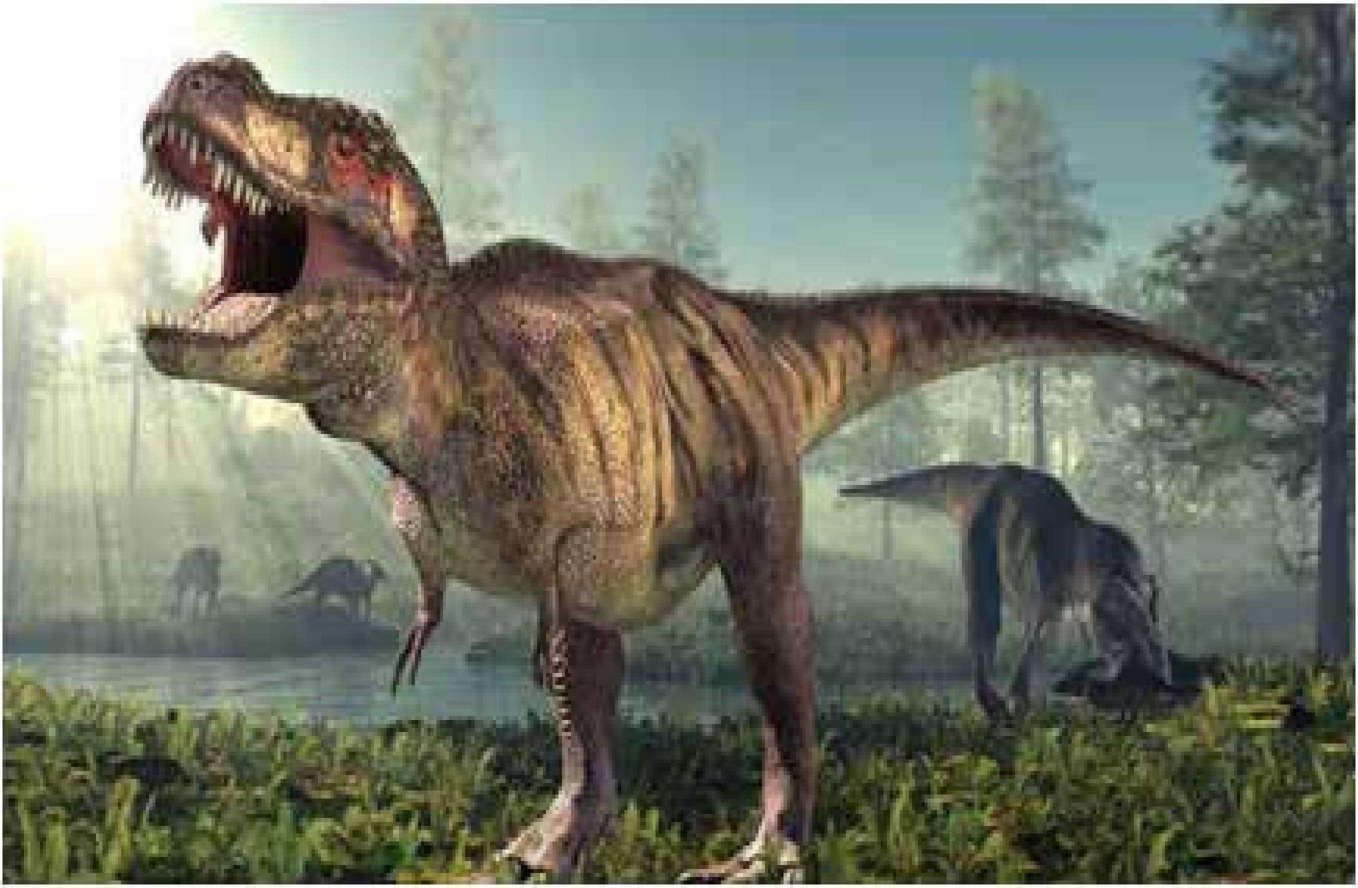

পাওয়া যায় ২০২০ সালে। সেই সময় ছাপগুলো পাঠানো হয়েছিল সুসানা মেইডমেন্ট ও তাঁর সহকর্মী পল ব্যারেটের কাছে। প্রথম দিকে সেগুলো নিয়ে সন্দেহ ছিল তাঁদের। পরে এর সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়।

ডাইনোসরের এমন ধরনের পায়ের ছাপের খোঁজ বিশ্বে তেমন মেলে না বলে জানিয়েছেন পল ব্যারেট। তিনি বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস, এর ফলে যুক্তরাজ্যে ট্রায়াসিক যুগের প্রাণী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হবে। এ দেশে ট্রায়াসিক ডাইনোসর সম্পর্কে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। তাই যুগটির কোনো কিছুর সন্ধান আমাদের কাছে সে সময়ের পরিস্থিতি তুলে ধরতে সাহায্য করবে।'

প্রাচীন এই পায়ের ছাপ সংরক্ষণ করা হবে কি না, তা জানিয়েছে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম। তাদের ভাষ্য, ছাপগুলো সাগরের স্রোতে বিলীন হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সৈকতেই থাকবে।

বেশি দাঁত, লম্বা নাকের ডাইনোসরের সন্ধান!

ডাইনোসর নিয়ে গবেষণা কম হয়নি। এখনও চলছে। আর তাতেই মানুষ জানতে পারছে নতুন নতুন জিনিস। খুলে যাচ্ছে এ বিষয়ে গবেষণার নতুন নতুন দরজা এবং জীবাশ্মবিদ্যা প্রাণীবিদ্যার নতুন চর্চার ক্ষেত্রও।

চার দশকেরও আগে সন্ধান মিলেছিল ডাইনোসরের কতগুলো হাড়ের। সময়টা ১৯৭৮ সাল। তারপর থেকে এত দিন পর্যন্ত তা জাদুঘরেই পড়েছিল। করোনা সংক্রমণের সময়ে বিশ্ব জুড়ে লকডাউনের আবহে মিউজিয়ামে পড়ে থাকা এ হাড়গোড় নিয়ে গবেষণা করেন এক গবেষক। আর তারপরই আশ্চর্য হওয়ার পালা। দেখা যাচ্ছে হাড়গুলো নতুন এক প্রজাতির ডাইনোসরের!

আগে যেসব ডাইনোসরের ফসিলের সন্ধান মিলেছে, সেগুলোর সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষণ হলো–এটির নাক আগে সন্ধান পাওয়া প্রজাতিগুলোর তুলনায় লম্বা, দাঁতের সংখ্যাও বেশি। নতুন এ প্রজাতির সন্ধান মিলেছে ব্রিটেনের

দক্ষিণ উপকূলের 'আইসল অব উইট' দ্বীপে। সেখানে প্রজাতিটি শনাক্ত করেন জেরেমি লকউড নামের এক পিএইচডি গবেষক।

গবেষণা প্রতিবেদনটি 'জার্নাল অব সিস্টেমেটিক প্যালিঅন্টোলজি'তে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডাইনোসরের হাড়গুলো ১৯৭৮ সালে আবিষ্কৃত। সেগুলো লন্ডনের 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম' ও 'আইসল অব উইট' দ্বীপের ডাইনোসর জাদুঘরে সংরক্ষিত ছিল। জেরেমি চার বছর ধরে এ হাড়গোড় নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। করোনাকালে হাড়গুলো পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখতে পান, এগুলো যে ধরনের প্রজাতির ইঙ্গিত করছে তা আগে সন্ধান পাওয়া প্রজাতির চেয়ে ভিন্ন।

কী রকম ভিন্ন? নতুন প্রজাতির এ ডাইনোসর লম্বায় প্রায় আট মিটার। ওজন আনুমানিক ৯০০ কিলোগ্রাম। নতুন এ প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে 'ব্রাইস্টোনিয়াস সিমোনদসি'। গবেষক জেরেমি বলেন, প্রায় ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে সবাই জেনে এসেছে ডাইনোসর মূলত দুই প্রজাতির। এগুলোর ২৩ কিংবা ২৪টি দাঁত থাকে, নাক স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। তবে নতুন প্রজাতির ডাইনোসরের দাঁতের সংখ্যা ২৮, এর নাকও অন্য ডাইনোসরের চেয়ে বড়ো এবং লম্বা।

৭ কোটি বছর আগে ছিল দন্তহীন ডাইনোসর

ডাইনোসরের বহু পুরোনো ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গেছে ব্রাজিলে। সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই প্রাণীর নতুন এক প্রজাতির তথ্য মিলেছে।

জানা গেছে, দক্ষিণ আমেরিকার এই অঞ্চলে সাত থেকে আট কোটি বছর আগে দন্তহীন ডাইনোসর বিচরণ করত। এগুলোর দুটি করে পা ছিল, উচ্চতা আড়াই ফুট এবং দৈর্ঘ্য ছিল তিন ফুট। টেরোসরদের কবরস্থান খ্যাত ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলীয় পারানা প্রদেশের পৌরশহর ক্রুজেরিও দো ওয়েস্তে থেকে

ফসিলগুলো পান দেশটির জাতীয় জাদুঘরের বিশেষজ্ঞরা। ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ওই এলাকায় খনন কাজের সময় নতুন প্রজাতির এই ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া যায়।

এই গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ব্রাজিলের জাতীয় জাদুঘরের জীবাশ্মবিদ জেনোভান আলভেস দে সৌজা। তিনি বলেন, ফসিলগুলো পেয়ে তারা বিস্মিত হন। সব ফসিল একত্র করে ক্রেটাসিয়াস যুগের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাইনোসরের কঙ্কাল মনে হয়েছিল। এ থেকে অসাধারণ কিছু আবিষ্কার হতে পারে বলে তখনই ধারণা করা হয়েছিল। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেকটা পাখির মুখের মতো মুখওয়ালা ডাইনোসরের তথ্য উঠে আসে।

দাঁত না থাকা ডাইনোসরগুলোর খাবার কী ছিল, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে এরা যে মাংস খেত না এটা বলা যাবে না। ■

সহকারী পরিচালক, বাংলা একাডেমি

ডাইনোসর

রোমানুর রোমান

ইয়া বড়ো ডাইনোসরে
পাহাড় বনে থাকে,
পথচারী ভয়ে কাঁপে
ডাইনোসরের ডাকে।
পা ফেললে আস্ত নড়ে
উঁচু উঁচু পাহাড়,
বড়ো বড়ো প্রাণী ছাড়া
হয় না তাদের আহার!
আহার করে মানুষ পেলেও
এক নিমিষেই ফিনিস,
ভাবতে পারো ডাইনোসরে
কী ভয়ানক জিনিস!
ভাবলে করে গা ছমছম
দেখলে জানি কী হতো!
ভাগ্যিস তারা অতীতকালেই
হয়ে গেছে নিহত।
বিলুপ্ত হয় অতীতকালেই
এই পৃথিবীর বুক থেকে,
তাই তো আমরা বেঁচে গেছি
ডাইনোসরের মুখ থেকে!

বিতর্কে হাতেখড়ি

নাজমুল হুদা

পড়ে কি বিতর্ক শেখা যায়? এক কথায় উত্তর-না! এজন্য কলাকৌশল জানার পাশাপাশি প্রয়োজন হয় নিবিড় অনুশীলন, নিয়মিত চর্চা। তার আগে জানা দরকার বির্তক কী? কেনই বা আমরা বিতর্ক করব? বাক ও বিতর্কের পার্থক্য কোথায়? সহজ কথায় উত্তর হলো–তর্কের যেখানে শেষ বিতর্কের সেখানে শুরু। শর্ত হলো, কথার সাথে যুক্তির যোগ থাকতে হবে। ভালো বিতর্ক করতে হলে যুক্তির জোরও থাকতে হয়। সাধারণ অর্থে শিক্ষার্থীরা যখন যুক্তির প্রতিযোগিতা বা প্রদর্শনীতে অংশ নেয় কিংবা নির্বাচনে প্রার্থীরা যখন বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন তা আমাদের কাছে বিতর্ক বলে মনে হয়। কারণ সেখানে যুক্তি দিয়ে কথা বলতে হয়। যুক্তিই বিতর্কের সৌন্দর্য ও শক্তি। শুধু যুক্তি দিয়ে কথা বললেই কি যথার্থ বিতর্ক হবে? বিচারকমণ্ডলী ও দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে সাথে দরকার হয় কথা-কৌশল, কণ্ঠের কারুকাজ, অঙ্গভঙ্গির ভারসাম্য এবং যথার্থ বাক্যনির্মাণ ও সাহিত্যরস। কারণ Debate is an Art of Argument. ইংরেজি 'Debate' শব্দটি মূলত ল্যাটিন শব্দ dis-(expressing reversal) + battere 'to fight সংযোগে গঠিত। আবার বৃহৎ অর্থে বলা হয় 'বিতর্ক হচ্ছে উদ্বুদ্ধকরণের শিল্প। বিতর্ক শুধু শিল্প নয়, জ্ঞানচর্চারও একটি অসাধারণ মাধ্যম। সৌন্দর্যমণ্ডিত, পরিশীলিত, যুক্তিপূর্ণ তর্কই হচ্ছে বিতর্ক। বিতর্কে যেমন থাকতে হয় যুক্তির জোর, তেমনি সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। যিনি খুব সুন্দর, সাবলীলভাবে সবার সামনে কথা বলতে পারেন, তিনি সহজেই সবার মন জয় করে নিতে পারেন। সুতরাং মন জয়ের জন্য বা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার জন্য চাই সুন্দর, শুদ্ধ বিতর্ক চর্চা, যুক্তির অনুশীলন। আর যারা সেই চর্চা করে তারাই তো বিতর্কিকা, আগামী দিনের পথিক। বক্তৃতা, উপস্থাপনা বা ভালো বিতর্কের জন্য কিছু বিষয়ের প্রতি বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে; অনুশীলনের মাধ্যমে পারদর্শিতা বাড়াতে হবে। যেমন:

স্ক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ
মাইক্রোফোনের ব্যবহার
অঙ্গভঙ্গি ও বাচনভঙ্গি
শারীরিক অবস্থান
স্ক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

একজন ভালো বক্তা বা বিতর্কিকার অপরিহার্য সঙ্গী স্ক্রিপ্ট বা বক্তব্যের খসড়া। স্ক্রিপ্ট মানে লিখিত বক্তব্য। শুধু লিখে ফেললেই তো হলো না। এটির

সদ্ব্যবহারও জানতে হবে। কেউ কেউ বড়ো বড়ো কাগজ ও পুরো খাতা নিয়ে স্টেজে উঠে বিতর্ক করেন। ছোটো ছোটো কাগজে বক্তব্যের মূল পয়েন্ট এবং যুক্তি প্রদান ও খণ্ডনের বিষয়গুলো টুকে নিলে একটি স্ক্রিপ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে; বলাও সহজ হয়। কেউ কেউ আবার পুরো স্ক্রিপ্ট পাঠ করে যান। এটি একজন বিতর্কিকার বক্তব্য হতে পারে না। আবার স্ক্রিপ্টের দিকে একবারও না তাকিয়ে পুরো স্ক্রিপ্ট মুখস্থ বলে যাওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। হাতে একদম কাগজ না রেখে বিতর্ক করা অবশ্যই কৃতিত্বের ব্যাপার। কিন্তু এতে একটি ঝুঁকি থেকে যায়। মনে হতে পারে, বিতার্কিকা মুখস্থ বলছেন। কেউ কেউ পুরো স্ক্রিপ্ট লিখে নিয়ে যান এবং প্রায়ই স্ক্রিপ্টের দিকে তাকান। এতে একজন সংবাদ পাঠকের সঙ্গে বিতর্কিকার কোনো পার্থক্য থাকে না। যে-কোনো বিতর্কে স্ক্রিপ্টের সর্বোত্তম ব্যবহার হচ্ছে স্বল্পতম স্ক্রিপ্টনির্ভরতা।

স্ক্রিপ্ট নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই কৌশল ব্যবহার করতে হবে। পাঁচ মিনিটের বক্তব্যকে কয়েকটি উপ-শিরোনামে বিভক্ত করতে হবে। স্ক্রিপ্টে উপ-শিরোনামগুলো লিখিত থাকবে। উপ-শিরোনামের দিকে তাকানো মাত্রই যেন বিতর্কিকার সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটুকু মনে পড়ে। এভাবে অনুশীলন করলে একজন বিতর্কিকা তার স্ক্রিপ্টের দিকে তাকাবেন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তাহলেই সাবলীলভাবে স্ক্রিপ্ট ব্যবহার তার আয়ত্তে আসবে। ২য় বক্তা এবং ৩য় বক্তা অবশ্যই পাঁচ মিনিটের জন্য স্ক্রিপ্ট করবেন না। যেহেতু তাদের আগে প্রতিপক্ষের এক বা একাধিক বক্তা বক্তব্য রাখেন, তাই প্রতিপক্ষের বক্তা বা বক্তাদের যুক্তি খণ্ডনের পরিসর রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে চার বা সাড়ে চার মিনিটের স্ক্রিপ্ট হওয়া যুক্তিযুক্ত। দলীয় সমন্বয়ের কথাটি মাথায় রাখতে হবে। দলের তিনজন বক্তাকেই পরস্পরের স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, যেন কোনো ক্ষেত্রেই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আবার এটিও খেয়াল রাখতে হবে, যেন স্ববিরোধী বা সাংঘর্ষিক কোনো উপকরণ না থাকে কারও স্ক্রিপ্টে। যদি কারও স্ক্রিপ্টে অতিরিক্ত বক্তব্য থাকে এবং কারও স্ক্রিপ্টে বক্তব্যের ঘাটতি থাকে, তবে সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে দলে তিনজন বিতর্কিকার স্ক্রিপ্টই সুগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দলের তিনজন বিতর্কিকার মনোভাব হবে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতামূলক, প্রতিযোগিতামূলক নয়।

মাইক্রোফোনের ব্যবহার

মাইক্রোফোনের যথাযথ ব্যবহারের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে শারীরিক ভাষা নির্মাণে। সংসদীয় বিতর্ক ছাড়া অন্য বিতর্কগুলোতে মাইক্রোফোন ডায়াসের সঙ্গে বিন্যস্ত থাকে। অনেকেই মাইক্রোফোনটি হাতে নিয়ে শব্দযন্ত্র পরীক্ষকের মতো মাইক্রোফোনে ফুঁ দিয়ে আওয়াজ পরীক্ষা করেন। এটি অত্যন্ত রুচিহীন ও দৃষ্টিকটু কাজ। কোনো বিতর্কিকার যদি এ নিয়ে সন্দেহ থাকে, তবে তিনি আঙুল দিয়ে আলতো টোকা দিলেই বুঝতে পারবেন মাইক্রোফোনটি সচল না অচল। কেউ কেউ মুখের এত কাছে মাইক্রোফোন ব্যবহার করেন যে তাঁর কথা স্পষ্ট শোনা যায় না এবং দৃষ্টিকটু লাগে। আবার মাইক্রোফোন খুব দূরে রাখারও প্রয়োজ্য নেই। মুখ থেকে তিন চার আঙুলের দূরত্বে থাকলে মাইক্রোফোনের যথাযথ কার্যকারিতা পাওয়া যায়। এ বিষয়গুলো অবশ্যই বিতর্কিকাকে লক্ষ রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা তার প্রতি বিচারক ও দর্শকদের ইমপ্রেশন নেতিবাচক করে দেয়।

অঙ্গভঙ্গি ও বাচনভঙ্গি

যে-কোনো বাচিক শিল্পের মতো বিতর্কে শারীরিক ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সংগীত, অভিনয়, আবৃত্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন শারীরিক, ভাষা, বাচনভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কও এর ব্যতিক্রম নয়। শারীরিক ভাষা নান্দনিক বোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিতর্ক শুধু শোনার বিষয় নয়, দেখারও বিষয়। বিতর্কিকের বাহ্যিক সৌন্দর্য যাই হোক না কেন, নিজেকে রুচিশীল ও যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারাই বিতর্কিকার প্রকৃত সৌন্দর্য। তবে অনেকেই শরীরকে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে কথা বলেন যেন বাচনভঙ্গি না হয়ে নাচনভঙ্গি মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে শারীরিক ভাষাকে খুব নিরীহ মনে হলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে বিতার্কিকার পারফরম্যান্সের ওপর।

মানুষের প্রতিটি প্রত্যঙ্গই সার্থক যোগাযোগে ভূমিকা পালন করে। বিতর্কের ক্ষেত্রে কিছু প্রত্যঙ্গের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তেজনা শক্তি নয়। এটি বরং দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। অনেকে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে বিতর্ক করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। মুখ ও হাতের বিকৃত ব্যবহার করেন। এটি কোনো বিতার্কিকের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না; বিশেষ করে সংসদীয় বিতর্কে উত্তেজনার কুরুচিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ মাঝেমধ্যে দেখা যায়। কোনো কোনো বিতার্কিকা এত বেশি অঙ্গভঙ্গি করেন, যা তাকে হাস্যকররূপে উপস্থাপন করে। কেউ কেউ উত্তেজনাবশত নিজের জায়গা ছেড়ে কথা বলতে বলতে কয়েক গজ দূরে চলে যান। উত্তেজনার কারণে তাদের হাত-মুখের ব্যবহার বেশ অশোভন হয়ে পড়ে। আক্রমণাত্মক বিতর্ক অবশ্যই করা যাবে। কিন্তু আক্রমণেরও সৌন্দর্য রয়েছে। সেই সৌন্দর্য ব্যাহত করে, এমন কোনো আচরণ করা উচিত নয়। এতে বিতার্কিকার নেতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে।

শারীরিক অবস্থান

শারীরিক ভাষা মূলত ইঙ্গিত। একজন বিতার্কিকা সম্পর্কে প্রাথমিক অথচ স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় শারীরিক ভাষা থেকে। খুব কৌশলী বিতার্কিকা যাঁরা, তারা শারীরিক ভাষার মাধ্যমে সহজেই চমৎকারভাবে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। বিতর্ক মঞ্চে বিতার্কিকের শারীরিক অবস্থান দুই ধরনের। প্রথমত, যখন তিনি বিতর্ক করছেন, সেই মুহূর্তের অবস্থান। দ্বিতীয়ত, অবশিষ্ট সময় যখন তিনি সতীর্থদের সঙ্গে বসে থাকেন। বিতর্ক করার সময় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। আনুভূমিক ও লম্বালম্বি উভয়ভাবে মাথার অবস্থান থাকবে সোজাসুজি। বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো বা কোমরে হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি অবশ্যই আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হতে হবে। কেউ কেউ পা নাড়াচাড়া করেন। এতে বিতর্কের গতি ব্যাহত হয়। সতীর্থদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করার সময় শান্ত ও মনোযোগী হতে হবে। মনোযোগ দিয়ে তিনি প্রতিপক্ষের বক্তব্য শুনবেন। সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলতে হলে নিচুস্বরে সংক্ষেপে তা সারবেন। কেউ কেউ বসে থাকার সময় এদিক সেদিক তাকান, চুল ঠিক করেন, নাক চুলকান। এগুলো অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং বিতার্কিকা হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

শারীরিক ভাষা কতটা নিখুঁত, তা বোঝা যায় বিতার্কিকের Eye Contact দেখে। বিতার্কিকের কাছে যান্ত্রিক বক্তব্য প্রত্যাশিত নয়। বিতার্কিকা যদিও মঞ্চে উপবিষ্ট 'সভাপতি', 'বিচারকমণ্ডলী' ও 'প্রতিপক্ষ' কে সম্বোধন করেন, এরপরও তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রে সামনে উপবিষ্ট দর্শক থাকতে হবে। যখন যাকে সম্বোধন করা হবে, তখন তাঁর দিকে তাকাতে হবে। সভাপতিকে সম্বোধন করে প্রতিপক্ষের দিকে তাকানো অর্থহীন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দর্শকদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়। যখন বিতার্কিকা দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা বলছেন, অবশ্যই দর্শকদের দিকে তাকাতে হবে। এভাবে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ হয়। নিখুঁত চোখের ভাষা ব্যবহার করে একজন বিতার্কিকা তাঁর বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা বহু গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন। এমনকি হাতের নান্দনিক ব্যবহার বিতার্কিকার শারীরিক ভাষাকে আকর্ষণীয় করে।

অনেক বিতার্কিকা হাত নিয়ে মহাবিপদে পড়ে যান। হাত নিয়ে কী করবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। বিতার্কিকা ডায়াসে গিয়ে কথা বলার সময় বক্তব্য রাখতে রাখতে হাতের পরিমিত ব্যবহার করতে পারেন। কেউ কেউ পকেটে হাত ঢোকান। এটি অনুচিত। কেউ কেউ ডায়াসে কনুই ভর দিয়ে রাখেন। এটি খুব দৃষ্টিকটু আচরণ। হাতের পরিমিত ব্যবহার করতে অপারগ হলে বিতার্কিক একটি নিরাপদ উপায় অবলম্বন করতে পারেন। ডায়াসের দুই প্রান্তে হাত দুটো আলতোভাবে রেখে বিতর্ক করা যায়। হাত যেন বুকের সঙ্গে আড়াআড়ি অবস্থানে না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শুধু হাতের ব্যবহার নয়, সমগ্র শারীরিক ভাষাকে আয়ত্তে আনার অনুশীলন করতে হবে যাতে বিতার্কিকা নিজেই বুঝতে পারেন, তাকে কোন অবস্থানে কেমন দেখাচ্ছে। শারীরিক অবস্থান সুদৃঢ় হলে বিতার্কিকার বক্তব্য বিচারকমণ্ডলী, দর্শক বা প্রতিপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে। ■

প্রাবন্ধিক

এসো গণনা শিখি

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

এক একে এক
দূর গগনে চেয়ে দ্যাখ,
দুই একে দুই
কানন জুড়ে জবা-জুঁই।

তিন একে তিন
খুকি নাচে তা ধিনধিন
চার একে চার
মা'র গলে সোনার হার।

পাঁচ একে পাঁচ
বাঁচার মতো এবার বাঁচ,
ছয় একে ছয়
সবে মিলে করব জয়।

সাত একে সাত
কাজ করব দিনরাত,
আট একে আট
শস্যশ্যামল, মাঠঘাট।

নয় একে নয়
শিখতে হবে সু-বিনয়,
দশ একে দশ
বাড়বে তোমার খ্যাতি-যশ।

মধুমাস

বেগম দিলরুবা খালেদা আমিন

আমাদের দেশে ও ভাই কত কী যে আছে,
আম-জাম-কাঁঠাল-লিচু ঝুলে থাকে গাছে।
বৈশাখ আর জৈষ্ঠ্য মিলে মধুমাস হয়,
ফলের রসে টইটম্বুর সুধীজনে কয়।
জাতীয় ফল কাঁঠাল সে তো এ সময়েরই ফল,
মৌ-মৌ গন্ধ নিলে জিহ্বায় আসে জল।
কালোজাম, সাদাজাম আনারস আরো,
পেট ভরে খেয়ে নাও, যে যত পারো।

মধুমাসের ফল

বারী সুমন

মধুমাসে মধুর ফল
পাবে কোন দেশে?
পেতে যদি চাও সবে
এসো বাংলাদেশে।

আম জাম কলা লিচু
তরমুজ কাঁঠাল কলা
যতই বলি শেষ হবে না
ফলের নাম বলা।

এ দেশের রূপ-রঙের
নাই যে তুলনা
চোখ জুড়ানো হরেক দৃশ্য
ভুলার মতো না।

এসো সাঁতার শিখি

গাজী আরিফ মান্নান

সাঁতার না থাকলে জানা
পানির মধ্যে নামতে মানা
বিপদ-আপদ ঘটে,
বিপদ থেকে বাঁচতে হবে
শরীর সতেজ রাখতে হবে
সাঁতার ব্যায়াম বটে।
লাইফ জ্যাকেটা গায়ে পরে
কাটবে সাঁতার কিনার ধরে
সবাই দলে দলে,
সাঁতার কাটা শিখতে হবে
সাহায্য নিয়ে নামতে হবে
নইলে ডুববে জলে।
শিশু-কিশোর সাঁতারে খুব
নিত্য যখন দিবে যে ডুব
আনন্দটা পাবে,
সাহস পাবে নিজের মাঝে
হাত বাড়াবে সকল কাজে
বিপদ কমে যাবে।

চাঁদের আলো

শাহ্ সোহাগ ফকির

সবাই যখন চমকে উঠি
পূর্ণিমা চাঁদ দেখে
অনুরাগে মন যে দোলে
বিষম জোৎস্না মেখে।

শিশিরভেজা পাতায় পাতায়
চাঁদের ছবি ভাসে,
শীতের হাওয়া দোল দিয়েছে
হিমেল মুখে হাসে।

দিঘির জলে দীঘল চাঁদটা
থালার মতো গোল
ঐ কৃষাণী পাড়ায় ঢেঁকি
বাজছে যেন ঢোল।

শিয়াল ডাকে থেকে থেকে
কাটছে না আর রাত,
আজকে যেন না হয় সকাল
দেখব জেগে চাঁদ।

জাদুই প্রাসাদ

মূল: এলসি স্পাইসার ইলস
অনুবাদ: আহমেদ জসিম

অনেক দিন আগে তারসেইরা দ্বীপের এলটস আরেস গ্রামে এক মেয়ে বাস করত। তার নাম ছিল পেরোলা, যার অর্থ মুক্তা। মেয়েটির লাবণ্য এমনই আকর্ষণীয় ছিল যে গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে তাকে মনে হতো বাস্তবিকই যেন এক দুর্লভ মুক্তা। তার স্বভাব-চরিত্রও ছিল চেহারার মতোই আকর্ষণীয়। সে ছিল তার বাড়ির এবং পুরো সমাজের কাছে অনাবিল আনন্দের উপলক্ষ্য।

বসন্তের কোনো এক সকালে সে গাঁয়ের দিঘিতে পানি আনতে গেল। দিঘির স্বচ্ছ পানিতে ঝুঁকতেই নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলো। সে বিমোহিত অপলক চোখে নিজের অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার চারপাশে একটা জাদুর আবেশ সৃষ্টি হলো। জলের পরি দিঘিতে এসে মেয়েটির চোখ-ধাঁধানো রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে তাকে জাদু করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি নিজের প্রতিবিম্বের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলো।

এদিকে পেরোলার অদৃশ্য হওয়ার খবরে ছোট্ট গ্রামটিতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। তার যে কী হয়েছে তা কেউই অনুমান করতে পারল না। তার মা মেয়ের নিরাপত্তার জন্যে সেন্ট রকি গির্জায় উপাসনায় রত হলেন। গ্রামবাসীরা সম্ভাব্য সকল স্থানে তাকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথাও পেলো না।

এদিকে তারসেইরা দ্বীপের উত্তর প্রান্তে সাগরে অনেকগুলো ছোটো ছোটো পর্বত ছিল; যাকে বিসকইটস বলা হতো। সেখানে বসবাস করতেন এক বিদূষী নারী। তার বিদ্যাবুদ্ধির জন্যে তিনি দ্বীপবাসীদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন।

গ্রামের উদ্যমী যুবকেরা পেরোলার নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানে দীর্ঘক্ষণ মরিয়া হয়ে খোঁজাখুঁজির পর তাদের মধ্য হতে একজন প্রস্তাব করল, 'চলো, আমরা বিষয়টি বিসকইটসের সেই বিদূষী নারীর সাথে আলোচনা করি এবং তাঁর পরামর্শ চাই।'

যেই কথা সেই কাজ। এলটস আরেস গ্রামের যুবকদল সেই বিদূষী নারীর শরণাপন্ন হলে তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমাদের গ্রামের সুন্দরী মুক্তাটি নিরাপদেই আছে। তাকে মর্মর পাথর, হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোসা এবং মুক্তাদানার তৈরি জাদুই প্রসাদে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। জলের পরিটি পেরোলাকে একটি ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে দিঘি হতে গিনজাল লেকের জাদুই প্রাসাদে নিয়ে যায়। যেখানে সে লুকায়িত অবস্থায় আছে। পরিদের ধারণা, তার অবস্থান সম্পর্কে জানা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।'

অতঃপর এলটস আরেসের তরুণরা ওই বিদূষী নারীর নির্দেশনা অনুসরণে তাদের খেলার সাথীর সন্ধানে একটি অভিযানের আয়োজন করল। তারসেইরা দ্বীপের বিভিন্ন স্তরের জনগণ এই অভিযানে সামিল হলো। তারা সেই জাদুই প্রাসাদের সন্ধানে সারা দ্বীপে পই-পই করে তল্লাশি চালাল।

অবশেষে সেন্ট জনস দিবসে – যেদিন দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান – তারসেইরার ওই সাহসী অভিযাত্রী দল তল্লাশি করতে করতে দ্বীপটির প্রান্তে অবস্থিত গিনজাল লেকের পাড়ে এসে উপস্থিত হলো।

এরই মধ্যে দলের একজন হঠাৎ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে, এটাই তো সেই জাদুই জায়গা। নিশ্চয়ই এই লেকেই পরিদের সেই মর্মর পাথর, হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোসা ও মুক্তাদানার তৈরি জাদুই প্রাসাদটি রয়েছে।'

অপর একজন জিজ্ঞেস করল, 'পেরোলাকে উদ্ধার করার জন্য আমরা কিভাবে সেই জাদুর প্রাসাদে পৌঁছাতে পারি?'

'কিভাবে আমরা তার জাদুবশ্যতা ভাঙতে পারি'? আরেকজনের প্রশ্ন।

অভিযানের নেতা বলল, 'ঠিক আছে। চলো, আমরা সকলে এই লেকের ধারে অবস্থান গ্রহণ করি। তারপর শলা-পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেব কীভাবে লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারি।'

এদিকে সেন্ট জনস দিবসের শুভক্ষণে পেরোলার মা মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য এলটস আরেসের সেন্ট রকি গির্জায় গভীর উপাসনায় মগ্ন হলেন।

উপাসনারত অবস্থায় হঠাৎ তিনি একটি অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনলেন, 'তোমার প্রার্থনা এবং তরুণ অভিযাত্রীদের অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা অবশেষে সার্থক হয়েছে। এবার শান্ত হও। সেন্ট পিটার দিবসের সূর্যাস্তের সময় তোমার কন্যা তোমার বুকে ফিরে আসবে। তার জাদুবশ্যতা ভেঙে যাবে এবং সে সাদা রাজহাঁসের টানা একটি হাতির দাঁতের নৌকায় গিনজাল হ্রদের তীরে পৌঁছে যাবে।'

হ্রদের তীরে অবস্থানরত অভিযাত্রী দল ওই শুভ সংবাদ শুনে সমস্বরে এমন গগণবিদারী চিৎকার জুড়ে দিলো যে সেটাই যে-কোনো জাদুবশ্যতা ভাঙার জন্যে যথেষ্ঠ মনে হলো। নির্ধারিত সময়ে পেরোলাকে বরফ-শাদা রাজহাসচালিত হাতির দাঁতের নৌকায় চড়িয়ে হ্রদের তীরে আনা হলো। তাকে ছোট্ট এলটস আরেস গ্রাম থেকে অদৃশ্য হওয়ার দিনের মতোই সুশ্রী ও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল।

এটাই হলো গিনজাল হ্রদের গল্প। জলপরিদের সেই মায়াময় প্রাসাদটি আজও সেভাবে সেখানেই রয়েছে। ■

অনুবাদক ও গল্পকার

নজরুলের নাম সমাচার

এস এম সিহাব

কাজী নজরুল ইসলাম নামটি শুনলেই বুঝতে কারো বাকি থাকে না যে, তিনি হচ্ছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এই নামেই তিনি সর্বজনীন পরিচিত। তবে বাবা-মায়ের রাখা এই নামের বাইরেও রয়েছে তার আরও নাম। জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তেই আদর আর শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে এসব নামে ডাকা হত। তার প্রকৃত নামের বাইরে ওই সব নামেও বেশ পরিচিত ছিলেন কবি।

কবির জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, নানা নামে ডাকা হতো তাকে। 'দুখু মিয়া' থেকে 'জাতীয় কবি'র খেতাবও পেয়েছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তার সৃষ্টিশীলতা চমকে দিয়েছে গুরুজনদের। কবিতা ও গানে তার অনবদ্য সৃষ্টি আজও স্মরণ করে নতুন প্রজন্ম।

নজরুলের মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। বাবা কাজী ফকির আহমেদ। নজরুলের শৈশব কেটেছে দুঃখ

কষ্টের মধ্যে। মনে করা হয়, দারিদ্র্যের জন্যই কবির নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। কিন্তু না, পেছনের গল্পটা ছিল ভিন্ন। কবিকে ‘দুখু মিয়া’ নাম দিয়েছিলেন তার মা জাহেদা খাতুন। চার ছেলের অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম হয়। তাই শিশুকালেই নজরুলের নাম রাখা হয় ‘দুখু মিয়া’। ছেলেবেলায় কবি ‘তারা ক্ষ্যাপা’ নামেও পরিচিত ছিলেন। তার চারপাশের সবাই কবিকে এই নামে ডাকতেন। পরে তিনি ‘নুরু’ নামও ব্যবহার করেছেন। স্থানীয়দের অনেকে আবার তাকে ‘নজরআলি’ নামেও ডাকতেন। কবি ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। করাচি সেনানিবাসে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও নজরুলের সাহিত্য-সংগীত অনুরাগী মন ছিল জাগ্রত।

> তরুণ বয়স থেকে পূর্ণবয়স্ক পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলাম একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠেন

প্রাণবন্ত হৈ-হুল্লোড়ে আসর জমাতেন সেনানিবাসে। তার সঙ্গ সবাই উপভোগ করতেন। একসময় সেনানিবাসে কবি ‘হৈ হৈ কাজী’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

তরুণ বয়স থেকে পূর্ণবয়স্ক পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলাম একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠেন। সৈনিক হিসেবেও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। কবিতা ও গানের মাধ্যমে তার বিপ্লবী মনোভাব প্রতিফলিত হয়। অগ্নিবীণা হাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠে আর ধূমকেতুর মতো নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। রচনা করেন বিদ্রোহী কবিতা।

মুসলিম পরিবারের সন্তান এবং শৈশবে ইসলামী শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তবে তিনি বড়ো হন একটি ধর্মনিরপেক্ষ সত্তা নিয়ে। একই সঙ্গে তার মধ্যে বিকশিত হয় বিদ্রোহী সত্তা। ১৯২২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে রাজন্যদ্রোহিতার অপরাধে কারাবন্দি করে। পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন অবিভক্ত ভারতের ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসেবে পরিচিত হন।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের ‘জাতীয় কবি’র মর্যাদা পান। তাইতো আমাদের কাছে তিনি ‘জাতীয় কবি’ নামেই পরিচিত। কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় কবি ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, সিলেটে আসেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার গান ও কবিতা ছিল প্রেরণার উৎস। তাই পরবর্তী সময়ে তাকে ‘জাতীয় কবি’ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ২৪শে মে কবিকে সপরিবার ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। কবির জন্য ধানমন্ডিতে সরকারি উদ্যোগে একটি বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়। যার নাম ছিল ‘কবি ভবন’। সেখানে কবিকে রাখা হয় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কবির অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর এক বিশেষ সমাবর্তনে কবিকে সম্মানসূচক ‘ডিলিট’ উপাধিতে ভূষিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় এবং ‘একুশে পদকে’ ভূষিত করা হয়। ■

প্রাবন্ধিক

বৃষ্টি এলে

তৌফিক আলম তুহিন

বৃষ্টি এল আকাশ থেকে
টিনের চালে পড়ে টুপটাপ
খোকাবাবুর স্কুলে না যেতে পেরে
সকাল থেকেই মুখটি তার ভার।

বৃষ্টি এলে উপচে পড়ে
খাল বিল ভরাজলে
মাছ ধরতে যাবে সবাই
মানুষের কোলাহলে

একাদশ শ্রেণি, কুমিল্লা জেলা স্কুল কুমিল্লা

বিড়াল

মো. জাওয়াদ আলম

বিড়াল ছানা মরিচ খেয়ে
করছে অনেক কান্না
ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনে
ছোট্ট খুকি পান্না।
হরেক রকম ঔষধ খাওয়ায়
তাতেও কিছু হয় না
দুধ ভরা বাটি আনলে তবে
কান্না যে আর রয় না।

৭ম শ্রেণি, মুগদা আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

পরশমণি

মৌমিতা হোসেন

মনের মাঝে মায়ের স্মৃতি
ভেসে উঠে সারাক্ষণ
মা আমার পরশমণি
সাত রাজার ধন।

রাজার আছে রাজ্য
আমার আছে মা
মাকে ছাড়া এ ভুবনে
কাউকে চাই না।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর: ৯ম পর্ব]

আয়াপুরের আখ ক্ষেত ও অন্যরকম বিজয়

সুমন চলে যাওয়ার পর আমি আমাদের আস্তানার দিকে ফিরছি। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে আমাদের গুপ্তচর কুদ্দুস। তার এক ভাই হাসান ঝুমঝুমপুর রাজাকার ক্যাম্পে আছে। নামে রাজাকার, কিন্তু আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের গুপ্তচর। তার এক বন্ধু আছে– কালাম, সেও নামে আর্মিদের গুপ্তচর, কিন্তু আসলে অতি গোপনে আর্মির ভেতরের নানান খবর ফাঁস করে দেয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের গুপ্তচরদের কাছে। এমনিভাবে ফাঁস হওয়া একটা 'দুর্দান্ত খবর' নিয়ে এসেছে কুদ্দুস। তার ভাবভঙ্গি দেখেই আমি বুঝতে পারি, আসলেই দুর্দান্ত খবরই নিয়ে এসেছে আমাদের সবচেয়ে সাহসী আর বিশ্বস্ত গুপ্তচর কুদ্দুস। আমি মুখে আঙুল দিয়ে তাকে রাস্তায় চুপ থাকতে বললাম, তারপর তাড়াতাড়ি আমার ঘরে গেলাম। কুদ্দুসের হাঁপানি তখনো থামেনি। ক্লান্তি নয়, উত্তেজনায়ই সে হাঁপাচ্ছে বুঝতে পেরে আমি ওর হাত ধরে বললাম– ঘাবড়াও কেন, কুদ্দুস? কোনো ভয় নেই। শিগগির বলো, বিষয় কী।

– ওরা কাল অস্ত্রশস্ত্র দিতে যাবে চাঁড়াভিটা ও থানা সদরের রাজাকার ক্যাম্পে, দুই ট্রাক অস্ত্র। ওস্তাদ, খবর একেবারে নির্ভুল। যশোর-নড়াইল রোড দিয়েই যাবে। যাওয়ার পথে এক ট্রাক অস্ত্র দেবে চাঁড়াভিটা রাজাকার ক্যাম্পে। পরশু চাঁড়াভিটা বাজার লুটের পরিকল্পনা

নিয়েও এই ক্যাম্পে আলোচনা হবে। অন্য ট্রাকটি অস্ত্র নিয়ে যাবে থানা সদরের রাজাকার ক্যাম্পে।

কুদ্দুসের শেষ কথাগুলো আমার কানে ঢুকল কিনা জানি না। মুহূর্তেই আমার মন চলে যায় আমাদের প্রথম অপারেশনের স্থান শালবরাট-রামকান্তপুর মোড়ের সেই কালভার্টের কাছে। সেই সফল অপারেশনের স্মৃতি আমাকে সাহসী করে তোলে। তবে আশেপাশে কোনো ব্রিজ বা সুবিধাজনক পজিশনের জায়গা আছে কিনা, সে সম্পর্কে তথ্য না থাকায় একটু চিন্তিতও হই; ওই এলাকা রেকি করার সময়ও ছিল না; কারণ, পরদিনই শত্রুরা অস্ত্র নিয়ে যাবে চাঁড়াভিটা ও রতনপুরে। হাতে সময় শুধু রাতটুকু। দ্রুত অন্যদের ডাকি পরামর্শের জন্য। ওরা এলে আমি সব কথা খুলে বলি। ওরা বাজার লুট করতে যাবে পরশুদিন, হাতে আরও একদিন সময় আছে। কিন্তু কাল শত্রুদের ঠেকাবো কী করে! ওদের ঠেকানোর জন্য উপযুক্ত পজিশন কোথায় পাওয়া যাবে, সেটাই হলো আলোচনার প্রধান বিষয়। আমি ওয়াকিটকিতে জমির ভাইয়ের সাথে কথা বললাম। হঠাৎ জমির ভাই-ই বুদ্ধিটা বাতলে দিলেন। বললেন–দাউদপুর, রোস্তমপুর, আয়াপুর– এসব জায়গায় রাস্তার দু'পাশে আছে আমন ধানের জমি। ধানের গাছও বেশ উঁচু আর ঘন। তাছাড়া, খেয়াল করে দেখো– রাস্তার দক্ষিণ পাশে আয়াপুরের দিকে বেশ কয়েকটা বড়ো বড়ো আখের ক্ষেত রয়েছে। এই দুর্ভেদ্য আখের ক্ষেতগুলোই হবে তোমাদের দুর্গ। মানুষের ঘরে ঘরে যেমন আমাদের দুর্গ আছে, তেমনি আছে মাঠেঘাটে-বনেজঙ্গলেও। বুঝতে পেরেছ আমার কথা? নাউ গো অ্যাহেড, মাই ফ্রেন্ড।

আমাদের আর চিন্তা করে সময়ক্ষেপণ করতে হলো না; আমাদের ইন্টেলিজেন্ট কমান্ডার সব বাতলে দিলেন অল্প কথায় চমৎকারভাবে। আমি তখনই সবাইকে বললাম– গেট রেডি। আজ রাতেই আমরা পজিশন নেব আয়াপুরের আখ ক্ষেতে। আমাদের মূল শেল্টার এখানেই থাকবে আপাতত। কালকের অপারেশন শেষ করে আবার এখানে ফিরে আসা যাবে। কালকের অপারেশন যদি সফল হয়, তাহলে ওদের পরশুর লুটপাট মিশন ভন্ডুল হয়ে যাবে; আমাদেরও চাঁড়াভিটায় রাজাকার ঠেকাতে যাওয়া লাগবে না– অন্তত দুয়েকদিনের জন্য হলেও সময় পাওয়া যাবে না।

রাত বারোটা নাগাদ আমরা রওনা দিলাম। একটা ছইওয়ালা গরুর গাড়িতে চাপানো হলো কয়েক বস্তা গোলাবারুদ, কিছু বাড়তি অস্ত্রও। শুকদেবপুর, পুকুরিয়া, লক্ষ্মীপুর, হাবুল্লোর ধানক্ষেত আর জলা কাদা-ঝোপজঙ্গল ভেঙে রাত দেড়টার সময় আমরা আয়াপুরের কাছাকাছি যশোর-নড়াইল রোডের উত্তর পাশের ঢালে পৌঁছি। খানিক বাদে হাবুল্লো-রোস্তমপুর কাঁচা রাস্তা হয়ে যশোর-নড়াইল মেইন রাস্তার ওপর দিয়ে অস্ত্র-গোলাবারুদ বোঝাই গরুর গাড়ি এসে থামে আমাদের কাছাকাছি, রাস্তার পাশে। রাস্তার নিচের ঢালে বেশ ঘন ঝোপজঙ্গল। তাড়াতাড়ি অস্ত্র-গোলাবারুদগুলো ঝোপের মধ্যে নামিয়ে রেখে গাড়োয়ানকে ছেড়ে দেওয়া হলো। দাদুরা, এই যে গাড়োয়ান, এর নাম কাসেদ, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের অস্ত্র-গোলাবারুদ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আনা-নেওয়ার কাজ করে। এর ঝুঁকির কথা একবার ভেবে দেখেছ? রাস্তায় বা প্রধান সড়কে যে-কোনো সময় সে আর্মি বা রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারে। আর ধরা পড়লেই যে জীবন শেষ, এটা শতভাগ নিশ্চিত। অথচ সে কোনো পারিশ্রমিক নেবে না। তার এক কথা: দেশের এই দুর্দিনে এটুকু কাজের জন্য টাকা নেব? ছি! ছি! এ তো আমার দায়িত্ব। এই দেশ আমার মায়ের মতো। তার জন্য এই সামান্য সেবাটুকু করতে পেরে আমি ধন্য। তোমরা আমাকে পারিশ্রমিক নিতে বলে আর লজ্জা দিও না।

তাহলে দাদুরা, এই গাড়োয়ান ছেলেটাও কি মুক্তিযোদ্ধা নয়? অবশ্যই সে মুক্তিযোদ্ধা। আসলে কাসেদ ছেলেটা কিন্তু পেশাদার গাড়োয়ান না। সে গরিবের ছেলে। ছাতিয়ানতলা হাই স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্র। বাবার সামান্য জমিজিরেত আছে। দুটো দুধের গাই আছে। দুধ বিক্রি করে। তা দিয়েই তাদের সংসার চলে টেনেটুনে। কাসেদ আগে কয়েকটা টিউশনি করত। যুদ্ধের সময় তা বাদ দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করে সে নিজেদের

গরুর গাড়িতে করে অস্ত্র পরিবহণের দায়িত্ব নেয়–এটাই ওর কাছে এক অন্যরকম মুক্তিযুদ্ধ। বাইরে থেকে দেখলে কিন্তু তাকে পেশাদার গাড়োয়ান ছাড়া কিছুই মনে হবে না। গাড়িতে কখনো খড়-বিচালি, কখনো ধান-চালের বস্তা আবার কখনো সাইজ-কাঠ বোঝাই থাকে। আর তার মধ্যেই লুকিয়ে অস্ত্র বহন করে সে। তল্লাশি করলে অবশ্যই সে ধরা পড়ে যেত, কিন্তু তখনো পর্যন্ত তার গাড়ি তল্লাশি হয়নি। আর হলেই বা কী! কাসেদের এক কথা: ধরা যদি পড়ি তো শত্রুদের দুয়েকটাকে খতম না করে মরব না। শেষমেষ তাই-ই হয়েছিল–দাইতলা অপারেশনের সময় গাড়িতে অস্ত্র পরিবহণকালে সে তারাগঞ্জের পশ্চিম পাশের এক মেঠো রাস্তায় রাজাকারদের একটা গ্রুপের হাতে ধরা পড়েছিল। তখন তার গাড়িতে চাপানো ছিল গোটাদশেক চালের বস্তা– চাল অল্প, অস্ত্র বেশি। স্বাভাবিকভাবেই বস্তা উঁচুনিচু দেখাচ্ছিল। এটা দেখেই ওইখানে টহলরত রাজাকারদের সন্দেহ হয় এবং তারা কাসেদকে চ্যালেঞ্জ করে। কাসেদ বুঝতে পারে, এবার সে ধরা পড়ে গেছে। তাই মুহূর্তেই সে তার কাছাকাছি লুকিয়ে রাখা একটা শটগান নিয়ে জয় বাংলা বলে হুংকার ছেড়েই ফায়ার শুরু করে। দশ-বারোজন রাজাকারকে খতমও করে; কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। গুলিবিদ্ধ এক রাজাকার পাশে পড়ে থাকা রাইফেলটি কাঁপা কাঁপা হাতে কাসেদের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দেয়। গুলিটা কাসেদের বুকে লেগেছিল, তাতেই শহিদ হয় সে। অবশ্য ওই রাজাকারও মুহূর্তে নিথর হয়ে যায়। এই হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা কাসেদের কাহিনি।

তো কাসেদের কথা থাক। এখন আগের কথায় আসি। রাস্তাটা পেরোলেই আয়াপুর গ্রাম। তার উত্তর মাথায় রাস্তায় লাগোয়া বড়ো বড়ো কয়েকটা আখের ক্ষেত। লম্বা এবং পুরুষ্ট আখগুলো ওপরের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা খুব দ্রুত অস্ত্র-গোলাবারুদের বস্তা ধরাধরি করে আখ ক্ষেতে নিয়ে যাই। এত রাতে চারদিক সুনসান। একটা ঝিঁঝি বা কুয়ো পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। তাহলে ওরাও কী বুঝতে পেরেছে, দেশে এখন যুদ্ধ চলছে? পিচ ঢালা পাকা রাস্তা বিশাল এক অজগরের মতো শুয়ে আছে যেন! আমরা নিরাপদে আখ ক্ষেতের দুর্ভেদ্য দুর্গে পজিশন নিলাম। ক্ষেতের কাদা-পানি বেশ আগেই শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। আর কদিন পরেই আখ কাটা হবে গুড় বানাবার জন্য ও খাওয়ার জন্য।

সব গোছগাছ করতে করতে রাত তিনটা বেজে যায়। তবুও আমাদের কারো চোখে ঘুমের লেশ নেই। সবাই আলোচনা করে অপারেশনের ছক আঁকি। ঠিক হলো– আয়াপুর বটতলা বরাবর মহাসড়কে যে ব্রিজটি আছে, তার দুপাশে আমরা লুকিয়ে থাকব– দক্ষিণ পাশে ব্রিজ-লাগোয়া ঘন আখ ক্ষেতের মধ্যে আর উত্তর পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে, রাস্তার নিচে ও রাস্তার ঢালে। দুপাশেই দুটি এলএমজি রাস্তার দিকে তাক করা থাকবে। চারজনের একটা সুইসাইডাল বা আত্মঘাতী স্কোয়াড তৈরি করা হলো, এরা অস্ত্রবাহী ট্রাকের ওপরে ও নিচে গ্রেনেড চার্জ করবে। এ কাজ করতে গিয়ে ওদের মৃত্যুও হতে পারে, এ কথা নিশ্চিত জেনেও সবাই হাত তুলে সুইসাইডাল স্কোয়াডে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল। সেদিন আমি আমার বিচ্ছুদের চোখে দেশপ্রেমের যে আগুন দেখেছিলাম, তার কোনো তুলনা হয় না। আজও আমার চোখে ভাসে সেই অম্লান আগুনের আভা। যাহোক, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম– তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তবে সবাই তো আর সুইসাইডাল স্কোয়াডে যেতে পারবে না, মাত্র চারজনকে আমি বাছাই করে নেব। এই বলে আমি আতিক, রুস্মন, বাবর আলী আর বিমলকে বেছে নিলাম। অসীম সাহসী এই চার বিচ্ছুর সাহস, কৌশল আর বীরত্বের পরিচয় এর আগেই আমি পেয়েছি। এদের নাম বলার পর এরা আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানায়; যেন কী মহামূল্যবান উপহার আমি তাদের দিয়েছি!

আরও ঠিক করলাম– আমাদের পজিশনের সামান্য ডাউনে মানে পুব দিকে রাস্তার দু'পাশের ঝোপে পজিশন নেবে আরও চারজন যোদ্ধা, তাদের হাতে থাকবে রাইফেল আর গ্রেনেড। আর্মি ট্রাক আক্রান্ত হওয়ার পর ওখান থেকে তারা ক্রলিং করে এগিয়ে আসবে এবং পলায়নপর কোনো আর্মিকে দেখলেই

তারা গুলি করে নিকেশ করবে।

ভোর পাঁচটা এক মিনিটে আমরা পজিশন ফাইনাল করলাম। বিচ্ছুরা যার যার পজিশনে গেল– সুইসাইডাল স্কোয়াডের সদস্যরাও হাসিমুখে আমাকে সালাম করে জায়গামতো চলে গেল। দু-দিকে দুটো এলএমজি বা লাইট মেশিন গান-এর দায়িত্বে থাকলাম আমি আর সাইদ। আমরা রুদ্ধশ্বাসে আর্মি-ট্রাকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ওদিকে বলদেঘাটার ব্রিজ বেশ কয়েকদিন আগেই আমরা উড়িয়ে দিয়েছি বলে আর্মিরা এখন আর দোরাস্তা হয়ে শর্টকাট রতনপুর থানা সদরের দিকে যেতে পারে না, তাই খানিকটা এই ঘুরপথে যাওয়া। বলদেঘাটার ব্রিজ অবশ্য মেরামত করা হচ্ছে, দিন-দুয়েকের মধ্যেই হয়ত চালু হয়ে যাবে। কিন্তু দুইদিন অনেক দিন। আমরা একদিনের ব্যবধানেই এমন এমন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলছি যে, দুইদিন আমাদের কাছে অনেক লম্বা সময়।

সকাল ছয়টা দশ মিনিট। সূর্যের সোনালি আলোয় চারদিক ঝিকমিক করছে। পাখিদের বিচিত্র সুরের গান শোনা যাচ্ছে। গাছের পাতারা যেন আড়মোড়া ভেঙে সেই সোনালি কিরণকে স্বাগত জানাচ্ছে। হঠাৎ রোস্তমপুরের ওদিক থেকে গাড়ির আওয়াজ ভেসে এল। আমরা নিশ্চিত হলাম আমাদের শিকার আসছে। দু-মিনিটও লাগল না। দুটো আর্মি ট্রাক আমাদের টার্গেট সীমায় চলে এল। আগেই বলা আছে– আক্রমণের জন্য নতুনভাবে কোনো কমান্ড দেওয়া হবে না; ট্রাক টার্গেট সীমায় এলেই আক্রমণ চালানো হবে। পরিকল্পনা মোতাবেক প্রথমেই আমার ও সাইদের এলএমজি গর্জে উঠল– আমার টার্গেট সামনের গাড়িটা, সাইদের টার্গেট পেছনেরটা। আমরা ট্রাকের ওপরের দিকে গুলি চালাচ্ছি, যাতে ঢালে পজিশন নেওয়া ছেলেদের গায়ে গুলি না লাগে। একই সময়ে সুইসাইডাল স্কোয়াডের আত্মঘাতী বিচ্ছুরা রাস্তার ঢাল থেকে একটু ওপরে উঠে গাড়ির চাকা ও বডির নিচের দিকে গ্রেনেড চার্জ করে, পরপর কয়েকটা। মুহূর্তে ট্রাকের চাকা পাংচার হয়ে লেংচাতে লেংচাতে সামান্য এগিয়ে থেমে যায়। আমাদের গোটা আক্রমণটা এমন নিখুঁত হলো যে, গাড়ি থেকে কারো আর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। আনুমানিক দুই মিনিট পর খানিকটা পুব দিক থেকে হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল– পরপর তিনটি। আমরা বুঝলাম, ওদিকে মোতায়েন করা আমাদের ছেলেরাই কোনো কাণ্ড ঘটিয়েছে। ওদিক থেকে উচ্চ শব্দে ভেসে এল কলজে কাঁপানো 'জয় বাংলা' ধ্বনি। এবার পরিষ্কার হলো– নিশ্চয়ই কোনো ট্রাকের ড্রাইভার বা কোনো সৈনিক পালিয়ে যাচ্ছিল, আমার মোতায়েন করা বিচ্ছুরা তাদের গুলি করে শেষ করেছে।

খানিকক্ষণ পর আর কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় আমরা অস্ত্র হাতে কয়েকজন এগিয়ে গেলাম ট্রাকের দিকে। অন্যরা থাকল পজিশনে। আমরা দেখলাম– প্রথম ট্রাকের ড্রাইভার, তার সহকারী এবং অস্ত্রের সাথে প্রহরী হিসেবে থাকা পাঁচজন সৈনিক সবাই মারা পড়েছে। দ্বিতীয় গাড়িতে ড্রাইভিং সিটে ড্রাইভার নেই, পাশের সিটে বসা তার সহকারীও নেই; তবে পাহারায় থাকা সব সৈন্যই খতম হয়েছে। দুটি ট্রাকই গুলি আর গ্রেনেডের আঘাতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র কিছু গাড়ির ভগ্নস্তূপের মধ্যে, কিছু এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় গাড়ির ড্রাইভার ও তার সহকারী কি পালিয়ে গেল? নাকি পুব দিকে ওত পেতে থাকা বিচ্ছুদের হাতে মারা পড়ল, এ নিয়ে ভাবছি। এমন সময় রতন, মোহন, শিপন আর কাউছার হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে। রতন বলে– বাবু ভাই, তোমার ধারণাই সঠিক। ওইখানে আমাদের এভাবে মোতায়েন না রাখলে দুই ব্যাটা পাকি ঠিকই পালিয়ে যেত। আমরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সব দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি দুই পাকি লেংচাতে লেংচাতে রাস্তার ঢাল দিয়ে পুব দিকে এগুচ্ছে। ওদের একজনের হাতে রাইফেল। ওরা একটু এগুতেই আমরা ওদের দিকে ফায়ার ওপেন করলাম। বেশি গুলি খরচ করতে হয়নি– মাত্র তিনটি। তাতেই দুই ব্যাটা ফিনিশ।

ভাবলাম, আয়াপুরের অপারেশন শেষ। এখনই এখান থেকে সরতে হবে। কারণ, কয়েক মাইল দূরে চাঁড়াভিটা বাজারে রাজাকার ক্যাম্প আছে। খবর

পেয়ে সেখান থেকে রাজাকার বাহিনী মুভ করতে পারে। তাছাড়া আর্মিরাও খবর পেয়ে এগিয়ে আসবে। তখন সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। আমরা তাই ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্রাক থেকে কিছু চাইনিজ রাইফেল আর কিছু গ্রেনেড নিয়ে উত্তর দিকে ধানের জমিতে নেমে পড়ি। আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকি। যথাসম্ভব নিচু হয়েই চলছি– অনেকটা ক্রলিং করে, যাতে দূর থেকে কারো নজরে না পরি। আমাদের আগের অস্ত্রের সাথে কিছু বাড়তি অস্ত্র যোগ হয়েছে বলে সবার বোঝা বেশ ভারী হয়েছে। তবু অপারেশন সফল হওয়ার আনন্দে সেই ভারী আমাদের কাছে তেমন বোধ হচ্ছে না। খানিক দূরে গিয়েই রোস্তমপুর হাবুল্লো কাঁচা রাস্তা। আমরা জমির আলের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করছি আর গাড়োয়ান কাসেদের জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের পূর্ব পরিকল্পনামতো এ সময়েই গরুর গাড়ি নিয়ে কাসেদের আসার কথা এই রাস্তায়। আমি বারকয়েক মাথা তুলে রাস্তার দিকে তাকাই, কিন্তু কোনো গাড়ি দেখতে পেলাম না। আমি ভাবলাম, অপারেশন একটু তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে বলেই হয়ত কাসেদের দেরি হচ্ছে ভেবে আমি চিন্তামুক্ত থাকার চেষ্টা করি।

সবাই আলের ওপর শুয়ে আছি। মিনিট খানেক পরেই শুনি সেই সংকেত-সংগীত: 'ওকি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চাইয়া রে...' মুহূর্তে আমি সবাইকে বলি– 'এসে গেছে, গেট রেডি...'

–কী এসে গেছে, বাবু ভাই?

–কী এসে গেছে?

–কী এসে গেছে?

সবাই একে একে জিজ্ঞেস করে– কী এসে গেছে? কারণ, বিষয়টি এতই গোপন রেখেছিলাম যে, আমি ছাড়া আর কেউ জানে না কাসেদকে আজ এখানে, এ সময়ে গাড়ি নিয়ে আসতে বলেছিলাম কাল। গাড়িতে অস্ত্রগুলো তুলে দিতে পারলে কাসেদ যেভাবেই হোক তা আমাদের সুঁড়োর আস্তানায় পৌঁছে দেবে– এ বিশ্বাস আমার ছিল এবং এখনো আছে। যে রাস্তা দিয়ে সে যাবে, তার আশপাশের গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রায় সবাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। প্রায় সব বাড়ির তরুণ-যুবক-প্রৌঢ়রাই মুক্তিযুদ্ধে গেছে। বাড়িতে আছে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা। দুয়েক ঘর পাকি-ঘরানার লোক

থাকলেও আশপাশে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি সফল অপারেশনের পর তারাও চুপচাপ ঘরের মধ্যে সেঁধে আছে। যারা রাজাকারে গেছে, তাদের পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য তাদের সাথে ক্যাম্পে বসবাস করছে, বাড়িতে দু-একজন বুড়োবুড়ি আছে বাড়ি পাহারা দিতে। আমরা পরে জেনেছিলাম– রাজাকারদের পরিবারের বুড়োবুড়িরা নাকি বিশ্বাস করত: মুক্তিরা কখনোই তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। কারণ, তাদের নাকি বিশ্বাস ছিল: যারা দেশের জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করছে, তারা নিরীহ বুড়ো মানুষদের ওপর আঘাত করবে না, শিশু ও মহিলাদের ওপরও না। দেশের সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ও সমর্থনের কারণেই তো আমরা এত সহজে গেরিলা হামলা চালাতে পেরেছি কিংবা আত্মরক্ষা করে আমাদের ঘাঁটিতে ফিরতে পেরেছি। আরও খুশির খবর কী জানো দাদুরা? তখনো পর্যন্ত এই ক'মাসে আমাদের কেউই শত্রুর হাতে মারা যায়নি; অর্থাৎ তখনো পর্যন্ত আমাদের জয়ের হার শতকরা একশ ভাগ।

কাসেদের সাংকেতিক গান শুনে আমি সহযোদ্ধাদের আবার বলি– কিছু শুনতে পাচ্ছ, তোমরা?

– কী! কী! কী শুনব, বাবু ভাই?

– গান।

– ওই, হ্যাঁ, হ্যাঁ– ও কি গাড়িয়াল ভাই তো? তাতে কী হলো?

– হলো, অনেক কিছু হলো।

আমার হেঁয়ালিপূর্ণ কথা শুনে সাইদ বেশ শব্দ করে বলে– সব খুলে বলো কমান্ডার। হেঁয়ালি ভালো লাগছে না– ভারি টেনশন হচ্ছে।

– কাসেদ আসছে।

– কাসেদ গাড়োয়ান?

– হ্যাঁ, গাড়োয়ান ও মুক্তিযোদ্ধা। আমরা শুধু গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। আর কাসেদ একই সাথে আমাদের অস্ত্রবাহক, গাড়োয়ান এবং সাহসী বীর গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা।

কাসেদের গান থেমে গেছে বেশ আগে। আমি একটু মাথা তুলে দেখি গাড়ি বেশ এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এ কী! গাড়িতে কাসেদ আছে ঠিকই; কিন্তু গাড়ির ছই এমন সাজানো কেন? ছইয়ের সামনের দিকে বরের বেশে কে এক তরুণ বসে আছে। তাহলে ছইয়ের মধ্যে বরের নতুন বউ আছে নিশ্চয়ই! গাড়ির পেছনে পেছনে নতুন পোশাক পরে হেঁটে আসছে চার-পাঁচজন লোক– তাদের মধ্যে প্রায় সবাই তরুণ-যুবক, একজন বয়স্ক– তার মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি। দেখলেই মনে হবে গাড়িতে নতুন বর ও তার বউ এবং পেছন পেছন যারা হেঁটে আসছে তারা বরের সঙ্গী– বরযাত্রী, বিয়ের পর সবাই নতুন বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। কারণ, সাংকেতিক গান পর্যন্ত ঠিক আছে– এ পর্যন্ত পরিকল্পনা আমার জানা। কিন্তু এখন একি দেখছি? এই নতুন বর, বরযাত্রী, সাজানো গাড়ি– এগুলো কী সত্যি, নাকি কাসেদের নিজের কোনো পরিকল্পনা? আমি একেবারে ভিমরি খেয়ে যাই। আমার একটু ভয়ও করতে থাকে তাহলে কাসেদ কি অস্ত্র পরিবহণের বদলে বিয়ের বর-কনে পরিবহণে লেগেছে! আমি চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকি গাড়ির ঝলমলে সাজগোজের দিকে। হঠাৎ কাসেদের ডাকে চমকে উঠি– কী, বাবু ভাই! ভড়কে গেলে নাকি?

– মিথ্যে বলব না, একটু তো ভড়কেছিই। ব্যাপার কী বলো তা কাসেদ? এতসব সাজগোজ...।

– সব টিরিক্স, কমান্ডার। এটা আমার নিজের উদ্ভাবন। এই 'বর', গাড়ির ভেতরের 'কনে', সাথে আসা 'বরযাত্রী'রা– সবই আমাদের লোক। এরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু বাইরের ভাবগতিক দেখে কে বলবে এটা বরের গাড়ি ছাড়া আর কিছু? যারা আমাকে চেনে বা আমার গোপন কাজের কথা যে দুয়েকজন জানে, তারাও আজ চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থেকেছে আমার গাড়ির দিকে। কেউই বুঝতে পারেনি আমার ভেলকি। এখন বলো কমান্ডার, কেমন দেখালাম?

আমি আলের কিনারে আধশোয়া অবস্থায়ই বলি– খুবই চমৎকার কাসেদ। তোমার তুলনা হয় না।

তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই ট্রিক্‌সই তো গেরিলা যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। তো, এখন তোমার 'বরের গাড়ি' ঘোরাও। সাধের গাড়ি এবার সুঁড়োমুখো যাবে, অস্ত্র নিয়ে আমাদের আস্তানায় যাবে। কাসেদ যেখানটায় গাড়ি থামিয়েছে, সেখানে রাস্তার দু'পাশে ঘন বনজঙ্গল। কয়েকটা বড়ো বড়ো আমগাছ, একটু দূরে দূরে আছে কয়েকটি তেঁতুলগাছ। প্রায় আধ কিলোমিটার রাস্তার দুপাশেই নানারকমের ঝোপঝাড়-বনজঙ্গল। ফলে বেশ নির্জন আর থমথমে। মুক্তিযুদ্ধের এ সময়ে মানুষ এমনিতেই বেশি বের হচ্ছে না রাস্তায়। তার ওপর মাঝে মাঝে আর্মি আসার গুজবে লোকজন নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে আসছে না। আর হাবুল্লো-রোস্তমপুরের এই জংলা রাস্তায় তো লোকজন এখন চলাচল করেই না বলা চলে। সুতরাং, আমাদের বাড়তি অস্ত্রগুলো কাসেদের গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো সহজেই। অস্ত্র তোলা শেষ হলে 'ও কি গাড়িয়াল ভাই...' গানের সুরে জংলা পথঘাট মুখরিত করে কাসেদ গাড়ি নিয়ে রওনা দেয় উলটো দিকে। গন্তব্য– শুকদেবপুর মুক্তিযোদ্ধা আস্তানা।

কাসেদ যাওয়ার পর আমরা একে একে ক্রলিং করে জঙ্গলের মধ্যে উঠি। সেখান থেকে এক-একজন করে রাস্তা পার হই। এই রাস্তায় গত একমাসে কোনো মানুষ চলাচল করেছে বলে মনে হয় না। কারণ, মাকড়শারা রাস্তার দু'পাশের গাছ বরাবর জাল বুনে রেখেছে এবং তাতে ছোটো ছোটো অনেক পোকামাকড় আটকা পড়েছে। অক্টোবর মাস হলেও জালে হালকা শিশির– কণাও জমে রয়েছে। যুদ্ধ দিনের এই বিপদের সময়েও মাকড়শার বড়ো বড়ো জাল দেখে আমি ভারি চমৎকৃত হই, মুহূর্তে গ্রাম্য একটি ধাঁধার কথা আমার মনে পড়ে। ধাঁধাটি হলো–

আট পা ষোলো হাঁটু,
জাল বোনেছে ম্যানা টাটু।
পানতি না পা'তে ডাঙ্গি পাতে,
মাছ না বাধে পানি বাধে।

এই ধাঁধার অর্থ হচ্ছেঃ মাকড়শা। এটি যশোরের আঞ্চলিক ভাষার, তাই তো শব্দ ব্যবহারও সেরকম। ধাঁধাটি মনে আসায় এক মুহূর্তের জন্য হলেও আমি ফিরে যাই আমার শৈশবে–যেখানে আমি, লাবিবা, সাবিত, আবির, আরাফ, ওয়াহিদ, নুহা সবাই মিলে 'মানে' ধরাধরি খেলতাম। আমরা ধাঁধাকে বলতাম– 'মানে'।

যাক সেকথা। রাস্তার পশ্চিম দিকের সীমানাজুড়ে শুরু হয়েছে একটি বিশাল মেহগনি বাগান। গাছগুলো এত বড়ো বড়ো যে, বাগানের ভেতরের মাটি সূর্যের আলোর স্পর্শ পায় না। দিনের বেলায়ও বেশ থমথমে অন্ধকার থাকে। বাগানটি আমাদের কমান্ডার জমির ভাইদের। হাবুল্লোর বাঁওড়ের পাশেই তাদের বাড়ি। তারা পাঁচ ভাই সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ায় বাড়িতে বুড়ো মা-বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। অবশ্য তারাও রাতে বাড়িতে থাকেন না, এর-ওর বাড়িতে রাত কাটান। তারপরও রাজাকাররা তাদের রেহাই দেয়নি। একবার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা-মা একটুও ভয় না পেয়ে জমির ভাইয়ের শেখানো কথাই গড়গড় করে বলে দিয়েছিলেন। তাতে রাজাকার কমান্ডার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা এত খুশি হয়েছিল যে, তারা তাদের চা-নাশতা খাইয়েছিল। তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে ছেলেরা কোথায় জিজ্ঞেস করলে বাবা-মা বলেছিলেন– ছেলেরা সব জয় বাংলা হয়ে গেছে, পাকিস্তানের শত্রু হয়ে গেছে। আমরা বাপু ওদের ত্যাগ করেছি। আমরা সোনার পাকিস্তানের পক্ষে। হায় রে, কী হলো দেশের! শেষ পর্যন্ত দেশটা ভেঙেই না যায়... বলতে বলতে তাদের গলা ধরে আসে নকল কান্নায়। বারকয়েক চোখও মোছেন তারা। তাদের এই পাকা অভিনয় ধরতেই পারল না রাজাকার কমান্ডার আর তার লোকেরা। তারা বরং খুশি হয়ে তাদের চা-নাশতা খাওয়ায়, তারপর তাদের গাড়িতেই বাড়ি পৌঁছে দেয়। এসব ঘটনা আমরা অবশ্য পরে জানতে পারি।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই। খানিক দূরে গিয়ে আমরা অবাক হয়ে দেখি, একজন বৃদ্ধলোক দাঁড়িয়ে আছেন একটা বড়োসড়ো মেহগনি গাছের নিচে। আমরা এর আগে তাকে কখনো দেখিনি বলে চিনতে পারিনি যে, ইনি জমির ভাইয়ের বাবা হাজি আসমত আলি। আমরা সতর্কভাবে অস্ত্র পজিশনে রেখে

দাঁড়িয়ে যাই। আমাদের ভাবভঙ্গি দেখে তিনি একটু হাসেন, তারপর ডান হাত উঁচিয়ে বলেন– আমি জমিরের বাবা। এসো, বাবারা। একটু পরেই তোমাদের খাবার আসবে আমার বাড়ি থেকে। আমি তোমাদের সব খবর রেখেছি তোমাদের গুপ্তচর কুদ্দুসের মাধ্যমে। আয়াপুর অপারেশনের খবর পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। মনে রেখো, বাবারা– তোমরা ন্যায়ের পথে দেশের জন্য যুদ্ধ করছ। আল্লাহর রহমতে তোমাদের জয় হবেই। আমি আমার পাঁচ ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছি হাসিমুখে, আরও বহু বাবা-মাও তাদের সন্তানদের পাঠিয়েছেন। এত মানুষের কষ্ট আর আত্মত্যাগ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না।

হাজি সাহেবের কথা শেষ হতেই আরেক দফা অবাক হওয়ার পালা আমাদের। ঘন মেহগনি বাগানের মধ্য থেকে যেন হঠাৎ করেই বেরিয়ে আসে কুদ্দুস– আমাদের প্রধান ইনফর্মার। তার পরপরই আসে কয়েকজন লোক। তাদের হাতে খাবারের পাতিল ও থালাবাসন, জগ-গ্লাস। এরইমধ্যে আমরা হাজি চাচাকে সালাম জানিয়ে তার সাথে হাত মেলাই। তিনি আমাদের সারিবদ্ধভাবে বসতে বললেন। আমরা অস্ত্রপাতি পাশে রেখেই বসে পড়ি। তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। আমরা বসতেই চোখের নিমিষে বিশটি প্লেট এসে গেল আমাদের সামনে। দ্রুত সবার হাত ধুইয়ে দিয়ে প্লেট ভরতি করে গরম ভাত দেওয়া হলো। গরম ভাতের কড়কড়ে ধোয়ায় নেশা ধরে যাওয়ার মতো অবস্থা। এরপর সেই ধোঁয়া ওঠা ভাতের ওপর দেওয়া হলো ঝোলওয়ালা গরুর মাংস। আহ্, কী যে স্বাদ, দাদুরা! এখনো সেই স্বাদ যেন মুখে লেগে রয়েছে! সবশেষে দেওয়া হলো নতুন ওঠা মুগ কলাইয়ের ঘন ডাল। অনেক দিন পর এমন ভালো খাবার খেয়ে আমরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলি আর হাজি চাচাকে বারবার ধন্যবাদ দিতে থাকি। তখন হাজি চাচা কী বললেন, জানো? হাজি চাচা বললেন– আমার অনেক বড়ো সৌভাগ্য যে, এতগুলো মুক্তিযোদ্ধাকে আজ পেট ভরে খাওয়াতে পারলাম। আমি তোমাদের জন্য দোয়া করি– তোমরা যেন যুদ্ধে জিতে বাড়ি ফিরতে পারো। তারপর বেশ শব্দ করে বললেন: জয় বাংলা!■

[চলবে...]

শিশু সাহিত্যিক

বাংলাদেশের আলপনা গ্রাম

বাঙালিরা বিভিন্ন উৎসবে আর বাড়ির আঙিনায় বা ঘরে আলপনা আঁকে। কিন্তু এই আলপনা যদি হয় সবসময়ের জন্য তাহলে সেটা কেমন হবে বলো তো বন্ধুরা? কারণ আলপনা মানেই হলো উৎসবের আমেজ। এটা স্বপ্ন মনে হলেও বাস্তবে এই পরিবেশ উপভোগ করতে হলে আমাদের যেতে হবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে নাচোল উপজেলার গ্রাম টিকইলে। সেখানে যাওয়ার পর মনে হবে আমরা হয়তো কোনো আর্টগ্যালারি বা কোনো উন্মুক্ত ক্যানভাসে এসেছি। কেননা এ গ্রামের মানুষগুলো তাদের বাড়ির দেয়ালগুলো ফুটিয়ে তুলেছে নান্দনিক সব আলপনা দিয়ে। তাই গ্রামটি দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে এখন আলপনা গ্রাম (The AlponVillage/ A village of Alpona) নামে পরিচিত। তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী ইলা মিত্রের স্মৃতিধন্য নাচোল উপজেলার নেজামপুর ইউনিয়নের গ্রাম টিকইল।

গ্রাম কথাটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে ছনের চাল, মাটির দেয়াল, খড়ের পালা, রাখাল একপাল গরুর পাল নিয়ে মাঠে যাচ্ছে, ছোটো ছেলে-মেয়ে দলবেধে খেলা করছে, নববধূ কলসি নিয়ে জল আনছে। কিন্তু আলপনা গ্রামের চিত্র একটু ভিন্ন।' গ্রামটি দেখলে মনে হবে কোনো শিল্পীর পটে আঁকা ছবি। ঘরগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর থরে থরে সাজানো। আর প্রতিটি বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে হাতে আঁকা নানা আলপনা। আলপনাগুলো গ্রামের গৃহিণী ও মেয়েদের আঁকা। বছরের পর বছর ধরে বংশ পরম্পরায় বাড়ির দেয়ালে তারা তাদের ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই শিল্পে বাদ যায় না রান্নাঘরও।

তবে বাড়ির উঠানে আলপনা আঁকা থেকে আলপনা গ্রাম হয়ে উঠার গল্প একটু আলাদা। এর পিছনে রয়েছেন ওই গ্রামের বাসিন্দা দেখন বর্মণ। তিনি বাসুদেব বর্মণের স্ত্রী। ছোটো বয়স থেকেই আলপনা

করার শখ ছিল দেখনের। অল্প বয়সে বিয়ে হলেও শখ ছাড়তে পারেনি। তাই সময় পেলেই আলপনা করতেন। নিজের মতো রং বানিয়ে উঠান আর মাটির ঘরের দেয়ালে আলপনা করতেন। স্থানীয় বাজারে রং পাওয়া যেতো না। আর পাওয়া গেলেও শখের আলপনা করার জন্য সাধ্য ছিল না। কিন্তু শখের তাগিদে এঁটেল মাটির সঙ্গে প্রাকৃতিক নানা জিনিস মিশিয়ে তৈরি করে নিতেন প্রয়োজনীয় রং। যেমন খড়িমাটি ভিজিয়ে 'আখির' বের করে তা থেকে লাল রং আর আতপ চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি করতেন সাদা রং। তাঁর দেখাদেখি গ্রামের অনেক নারীও তাদের মাটির দেয়ালে আলপনা করতেন। এখন দেখনের বয়স হয়েছে। চোখের যতিও কমে এসেছে। আগে যে আলপনা করতে পারতো নিমিষে তা এখন সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও সময় পেলে আলপনা করতে বসে যান বাড়ির উঠানে কিংবা দেয়ালে।

প্রথম দিকে বিভিন্ন পূজা-পার্বণে এ গ্রামের হিন্দু পরিবারের বউরা দেয়ালে সাদা রঙের তিনটি ফোঁটা এঁকে তাঁর নিচে দাগ দিয়ে খুব সুন্দর আলপনা আঁকতেন। তবে এখন তিন ফোঁটার সাদা আলপনা নয়, কল্পনার সব রঙেই ব্যবহার করা হয়। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা প্রতিযোগিতা করে আলপনা আঁকে।

আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে তারা আলপনার রং নিজেরাই তৈরি করে এবং এখনো-এর প্রধান উপাদান হচ্ছে মাটি। এক সময় এসব আলপনা আঁকার জন্য চক, গিরিমাটি, রং, তারপিন তেল ব্যবহার করা হত। কিন্তু, সেইসব আলপনার স্থায়িত্ব ছিল কম। তাই এখন গিরিমাটি, শুকনা, বরই চূর্ণ আঠা, আমের পুরাতন আঁঠির শাঁস চূর্ণ, চকগুড়া, মানকচু ও কলা গাছের আঠার সঙ্গে রঙের মিশ্রণকে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে রেখে আলপনার রং তৈরি করে আলপনা আঁকা হয়।

গ্রামের মেয়েরা সবাই আলপনার কারিগর। গ্রামটির ঘরে ঘরে নারীরা যেন হয়ে উঠেছেন একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী। আলপনা আঁকতে যেন এদের কোনো ক্লান্তি নেই, বংশ পরম্পরায় তারা আলপনার ঐতিহ্যকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। গাছ, লতা-পাতা, পাখি, নদ- নদীসহ গ্রামবাংলার সৌন্দর্য ওঠে তুলির প্রতিটি টানে। বাংলার ষড়ঋতু গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে ফুটে থাকে আলপনা হয়ে। বাড়ির দেয়ালে আঁকা আলপনা যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য অনেকেই ঘরের চালে পলিথিন বেঁধে রাখেন। বৃষ্টি হলেই খুলে দেন আবার বৃষ্টি কমে গেলেই গুটিয়ে ফেলেন।

দর্শনীয় স্থান না হলেও দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ঘুরতে আসেন এই আলপনা গ্রামে। বাসু বর্মণের বাড়িতে দর্শনার্থীদের জন্য একটি পরিদর্শন খাতা রাখা আছে। আলপনা গ্রামের সৌন্দর্য দেখে দর্শনার্থীরা পরিদর্শন খাতায় তাদের মন্তব্য লিখে রেখে যায়। প্রথমে ওই গ্রামের একটি মাটির বাড়িতে আলপনা করা ছিল। সেই বাড়ির নাম ছিল আলপনা বাড়ি। এখন প্রতিটি ঘরই আলপনা বাড়ি। শখের বসে করা আলপনা একদিন সবার মন ছুঁয়ে যাবে এটা কল্পনাও করেননি দেখন বর্মণ। ■

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

বক্সিংয়ে প্রথম স্বর্ণপদক বাংলাদেশের

সুরো কৃষ্ণ চাকমা। শুধু একটি নাম নয়, বাংলাদেশের এক নতুন ইতিহাস। তার হাত ধরেই আন্তর্জাতিক পেশাদার বক্সিং সাউথ এশিয়ান প্রফেশনাল বক্সিং ফাইট নাইট দ্য আল্টিমেট গ্লোরি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক পেশাদার বক্সিংয়ে বাংলাদেশের হয়ে স্বর্ণপদক জয় করেছেন তিনি। বাড়ি রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি উপজেলায়। পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বক্সিংয়ের আগে সাফল্য পেলেও এটিই তার আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। চার রাউন্ডের খেলায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ নেপালের মহেন্দ্র বাহাদুর চাঁদকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হন।

তিনি ২০১৩ সালে বাংলাদেশ গেমসে গোল্ড মেডেল, ২০১৪ সালে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হন। 'সাউথ এশিয়ান গেমস ২০১৯'- এ এমেচার বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জপদক জয় করেন। ২০১৮ সালে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে দুটি খেলায় জয়লাভ করেন। তার প্রথম আন্তর্জাতিক ইভেন্ট ২০১৪ সালের স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস। এছাড়া ২০১৫ সালে দেশসেরা বক্সার নির্বাচিত হয়ে লন্ডনে ছয় মাস ট্রেনিং করেন।

বিজয়ের অনুভূতি প্রকাশে তিনি বলেন, চ্যাম্পিয়ন হয়ে যখন লাল-সবুজ পতাকাটা তুলে ধরি, তখন নিজের মধ্যে অন্যরকম ভালোলাগা এবং গর্ববোধ কাজ করেছে। আমি এর আগে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেও এইরকম সৌভাগ্য আর কখনো হয়নি। এখন আমার স্বপ্ন বক্সিং-এ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া। সেই লক্ষ্যে কাজ করছি। ২০১৫ সালে লন্ডনে ট্রেনিং একইসাথে স্থানীয় বেস্ট ফাইটারদের সাথে ফাইট করি। সেখান থেকে বক্সিং এর প্রতি আরো অনুপ্রাণিত হই। ■

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর রোবট আবিষ্কার

প্রধানমন্ত্রীর নাম, বলতে পারে মন্ত্রী, এমপিদেরও নাম। বাংলা ও ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে, হাঁটতে পারে সামনে ও পেছনে, কাজ করবে রেস্টুরেন্টে। করতে পারে হ্যান্ডশেক। বন্ধুরা, আর এ কাজগুলো করছে একটি রোবট। এমনি এক রোবট তৈরি করেছেন আহসান হাবিব। বাড়ি লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার তুষভান্ডার ইউনিয়নের মানিক বাজার এলাকায়। তার দুই বছর গবেষণার ফল এই রোবট। ছোটোবেলা থেকেই তার নতুন কিছু করার চিন্তা। ইউটিউবে ভিডিও দেখে মাথায় আসে রোবট তৈরির।

হাবিব কালীগঞ্জ করিম উদ্দিন পাবলিক কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। বাবার নাম মজু মিয়া। টিউশনির টাকা দিয়ে রোবট তৈরির জিনিসপত্র কিনতেন। নিজের মতো করে গবেষণা চালিয়ে যান। আর এই রোবট তার সফলতার ফসল। রোবট দেখতে মানুষ তার বাড়িতে ভিড় করছেন। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও রোবট তৈরি করেছেন, এজন্য তাকে সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছে। হাবিব ছোটো থেকেই তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে পড়ে থাকতেন।

২০১৭ সালে তুষভন্ডার আরএমএমপি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াকালীন বিদ্যালয় তহবিলের টাকায় কাঠ দিয়ে একটি রোবট তৈরি করেন হাবিব। ওই সময় লালমনিরহাট জেলা বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মেলায় রোবটটি নিয়ে অংশ নিলে তিনি প্রথম হন। এরপরই তার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়।

তরুণ গবেষক আহসান হাবিব বলেন, বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করতেই আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা। আমার এ কাজে সাহস জুগিয়েছেন আমার মা ও বড়ো ভাই। রোবটটি রেস্টুরেন্টে কাজ করার উপযোগী করে বানিয়েছি। মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, ভারী খাবার বহন করবে। যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবে। এখনো আমি রোবটটির পুরোপুরি কাজ শেষ করিনি। অর্থের কারণে কাজ বন্ধ রেখেছি।■

প্রতিবেদন: মো. জোবায়ের হোসেন

আরেক পৃথিবী

সম্প্রতি সমুদ্রের নিচে সন্ধান পাওয়া গেছে বিশাল এক ফুটবল মাঠ। কি অবাক হচ্ছো বন্ধুরা? অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে সাগরের নিচে সিগ্রাস বা সাগরের ঘাস নামের এক প্রকার উদ্ভিদ ২০ হাজার ফুটবল মাঠের সমান জায়গা দখল করে আছে। যা ম্যানহাটনের চেয়ে তিন গুণ বড়ো। খবরটি প্রকাশ করেছে বিবিসি। জেনেটিক পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে সাগরের নিচে যে বিশাল তৃণভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে, তা মূলত একটি উদ্ভিদ। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে একটি মাত্র বীজ থেকে বিশাল এলাকা ব্যাপী তৃণভূমি সৃষ্টি করেছে সিগ্রাস নামের এই উদ্ভিদ। ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা জানিয়েছেন, এই তৃণভূমিটি প্রায় ২০০ বর্গকিলোমিটার (৭৭বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। অস্ট্রেলিয়ার শহর পার্থ থেকে ৮০০ কিলোমিটার উত্তরে শার্কবে নামক এলাকায় আকস্মিকভাবে এই তৃণভূমির সন্ধান পান গবেষকরা। নতুন এই প্রজাতির উদ্ভিদের বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষক দলটি জানায়, এই সিগ্রাস উদ্ভিদকে কেরিবন উইড বা ফিতা ঘাসও বলা হয়। উদ্ভিদটি অস্ট্রেলিয়ার উপকূল জুড়েই দেখা যায়। গবেষকরা উপকূলের বিভিন্ন জায়গা থেকে অঙ্কুর সংগ্রহ করেন এবং ১৮ হাজার জেনেটিক মার্কার পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি নমুনার ফিঙ্গার প্রিন্ট তৈরি করেন। তৃণভূমিতে মোট কতটি উদ্ভিদ আছে তা বের করাই ছিল গবেষকদের উদ্দেশ্য। গবেষণা নিবন্ধের প্রধান লেখক জেনএজলো বলেন, আমরা দেখতে পেয়েছি, উদ্ভিদের সংখ্যা মাত্র একটি! আর একটি মাত্র উদ্ভিদই শার্কবে'র ১৮০ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে আছে! নিঃসন্দেহে এটিই পৃথিবীর বৃহত্তম উদ্ভিদ।

বিশ্বের বড়োগুহা 'হ্যাংসনডুং'

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রাকৃতিক গুহার নাম হ্যাংসনডুং। এই গুহার ভেতরে রয়েছে ভূগর্ভস্থ নদী। স্থানীয় ভাষায় হ্যাংসনডুং অর্থ পাহাড়ি নদীর গুহা।

পাহাড়ি এই গুহার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী এক নদী। তাই এমন নামকরণ হলো। গুহার ভেতরের নদীতে নিয়মিত বন্যা হবার আশঙ্কা আছে। নদী ছাড়াও গুহার ভেতরে বেশ কিছু প্রাকৃতিক সুইমিংপুলও আছে। আছে নিজস্ব জলবায়ু। যা বাহিরের আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গুহার ভেতরে থাকা নদীর পানি বাষ্প হয়ে এর ভেতরে মেঘের সৃষ্টি হয়।

প্রায় দেড়শটি গুহার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে হ্যাংসনডুং গুহাটি। এর সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রায় ৬৬০ ফুট, সর্বোচ্চ প্রস্থ ৪৯০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ কিলোমিটার। এই গুহার ভেতরে অনায়াসে ৪০তলা ভবন নির্মাণ করা যাবে। এমন কি স্ট্যাচু অব লিবার্টিও এখানে খুব সহজেই এঁটে যাবে। হ্যাংসনডুং গুহার সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গা দিয়ে ছোটো খাটো তিনটি বিমান উড়ে যেতে পারবে। গুহাটির রয়েছে দুইটি প্রবেশদ্বার এবং সুদীর্ঘ প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ। যার দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ কিলোমিটারেরও বেশি। সুড়ঙ্গের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের আর একটি গুহার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। ভেতরে আছে দুটি বিশাল গহ্বর। গুহার ছাদ ভেঙে পড়েও গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। হ্যাংসনডুং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গুহার আয়তনের চেয়ে দ্বিগুণেরও বড়ো। অথচ সুদীর্ঘকাল মানুষ এই গুহার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানতো না। ১৯৯১ সালে স্থানীয় এক ব্যক্তি জঙ্গলে কাঠ কাটার সময় দেখতে পায় একটি পাথরের ফাটল দিয়ে পানি বেরিয়ে আসছে। বিষয়টি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তিনি এই গুহা আবিষ্কার করেন।

ব্রিটিশ গুহা গবেষণা সংগঠন ২০০৯ সালে এই গুহার আয়তন পরিমাপ করেন। তবে গুহার ভেতরে থাকা একটি চুনা পাথরের দেয়ালের কারণে তাদের সেই সমীক্ষা পূর্ণতা পায়নি। চুনা পাথরের তৈরি প্রাকৃতিক এই দেয়ালটি প্রায় পঁচিশ তলা বিল্ডিং-এর সমান উঁচু। পরবর্তীতে সেই দেয়াল অতিক্রম করে গবেষকেরা গুহার প্রকৃত আয়তন নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। ধারণা করা হয়, প্রায় ৩০ থেকে ৫০ লাখ বছর আগে প্রাকৃতিকভাবে এই গুহার সৃষ্টি হয়েছিল।

গবেষকেরা হ্যাংসনডুং-কে বিপজ্জনক গুহা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ গুহার ভেতরে আছে বিষধর সাপ, বড়ো মাকড়সাসহ বিভিন্ন অজানা প্রাণী। নিকষ কালো অন্ধকারের কারণে এখানে পথচলাও খুব কঠিন। গভীর বনের ভেতর দিয়ে টানা দুই দিন হেঁটে দুর্গম পথ অতিক্রম করে গুহার মুখে পৌঁছাতে হয়। হ্যাংসনডুং গুহায় ভ্রমণের জন্য কমপক্ষে চারদিনের খাবার, নদীতে চলার জন্য নৌকা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়ে যেতে হয়।■

প্রতিবেদন: ইফতেখার আলম

মাঙ্কিপক্স আতঙ্ক নয় চাই সচেতনতা

বন্ধুরা, করোনার পর আরও একটি রোগের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেবো– তা হলো মাঙ্কিপক্স। এ রোগটি মাঙ্কিপক্স নামক ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। ১৯৫৮ সালে প্রথম ড্যানিশ ল্যাবরেটরিতে বানরের মধ্যে এ ভাইরাসটি আবিষ্কৃত হয়। মানুষের মধ্যে এ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রথম শনাক্ত হয় ড্যামোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে ১৯৭০ সালে। এর দুটি ধরনের মধ্যে একটি হলো পশ্চিম আফ্রিকান অপরটি মধ্য আফ্রিকান। এ ক্ষেত্রে, পশ্চিম আফ্রিকান (৩.৬%) ধরনের তুলনায় মধ্য আফ্রিকান (১০.৬%) ধরনে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি।

ইতঃপূর্বে মাঙ্কিপক্সের রোগী সচরাচর পাওয়া যায়নি এমন ১২টি দেশে সম্প্রতি ৯২টি কেস শনাক্ত হয়েছে, যার ফলে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে এসব কেস শনাক্ত হয়েছে, যার সবকটিই পশ্চিম আফ্রিকান ধরনের।

মাঙ্কিপক্সের লক্ষণগুলো অনেকটা স্মলপক্স বা গুটিবসন্তের মতো। তবে স্বস্তির বিষয় হলো, এটি স্মলপক্স থেকে কম সংক্রামক এবং কম গুরুতর। ২ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। এছাড়া মৃত্যুহারও কম।

মাঙ্কিপক্সের উপসর্গ

মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হওয়ার সাধারণত ৬ থেকে ১৩ দিনের মধ্যে আর ক্ষেত্র বিশেষে ৫ থেকে ২১ দিনের মধ্যে প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, মাথা ব্যথা, মাংসপেশি ব্যথা, পিঠে ব্যথা, অবসাদগ্রস্ততা এবং দুর্বলতা দেখা যায়। তবে গুটিবসন্ত থেকে এর প্রধান পার্থক্য হলো এতে লসিকাগ্রন্থি বা লিম্ফ নোড (গলায়, বগলে ও কুঁচকিতে কিছু গ্রন্থি) ফুলে ওঠে।

সাধারণত প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ১ থেকে ৩ দিনের মধ্যে শরীরে ফুসকুড়ি দেখা দেয়, প্রথমে মুখে এবং পরে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মাঙ্কিপক্সের উপসর্গ প্রকাশ পেলে আক্রান্ত ব্যক্তি সংক্রামকে পরিণত হয় অর্থাৎ অন্যদের মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে দিতে পারে। সাধারণত ২ থেকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত এ রোগটি স্থায়ী হয় এবং রোগী নিজ থেকেই সেরে ওঠে।

যেভাবে মাঙ্কিপক্স ছড়ায়

সাধারণত মাঙ্কিপক্স মানুষ থেকে মানুষে খুব সহজে বিস্তার লাভ করে না। কিন্তু আক্রান্ত প্রাণী বা ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শে এলে অথবা শরীরে থাকা ক্ষত বা ফোসকার সংস্পর্শে এলে এ রোগ সুস্থ দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি, থুতু কিংবা দীর্ঘক্ষণ মুখোমুখি আলাপচারিতার ফলেও মাঙ্কিপক্স ছড়াতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যাদির (যেমন– পোশাক, বিছানা, তোয়ালে ইত্যাদি) সংস্পর্শে এলেও এটি বিস্তার লাভ করতে পারে।

মাঙ্কিপক্স প্রতিরোধে করণীয়

- মাঙ্কিপক্সের উপসর্গ রয়েছে এমন ব্যক্তির খুব কাছাকাছি থেকে কথা বলা পরিহার করা।
- কোনো পরিবারে কেউ আক্রান্ত হলে তাকে আলাদা রুমে রাখা এবং পরিবারের সবার মাস্ক ব্যবহার করা।
- মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত কোনো দ্রব্যাদির সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকা।
- যেহেতু শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে, সেহেতু সার্জিক্যাল মাস্ক পরিধান করা।
- নিয়মিত সাবান অথবা অ্যালকোহল সম্পন্ন হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করা।
- রান্নার সময় মাংস ভালোমতো সিদ্ধ করা।
- অসুস্থ, মৃত অথবা বন্য কোনো প্রাণীর সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকা।

আমাদের করণীয়

সতর্ক থাকা এবং লক্ষণযুক্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেলে অতিসত্বর নিকটস্থ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করা। এছাড়া ১০৬৫৫ হটলাইনে বিষয়টি অবহিত করা। ■

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় সেরা সুমাইয়া

২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় সারা দেশে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন সুমাইয়া মোসলেম নামের এক মেধাবী কন্যা। ৫ই এপ্রিল প্রকাশিত সুমাইয়া পেয়েছেন ৯২.৫ নম্বর। সব মিলিয়ে ৩৩ এর মধ্যে ২৯২.৫ নম্বর পেয়ে তিনি সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করেন।

খুলনার ডুমুরিয়ার মেয়ে সুমাইয়া ডুমুরিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করেছেন। দুটোতেই জিপিএ-৫ পেয়েছেন। পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষাতেও উপজেলায় প্রথম হয়েছিলেন তিনি। সুমাইয়ার বাবা মোসলেম উদ্দিন সরদার ডুমুরিয়া কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। মা খাদিজা খাতুন একজন স্বাস্থ্যকর্মী।

উল্লেখ্য, ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় ৭৯ হাজার ৩৩৯ জন পরীক্ষার্থী পাস করেছেন। যাদের মধ্যে মেধা অনুযায়ী ১ হাজার ৮৮৫ জন ছাত্র ও ২ হাজার ৩৪৫ জন ছাত্রী ভর্তি হতে পারবেন মেডিক্যাল কলেজগুলোতে। এবারের ফলাফলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি পাস করেছে।

৭০ ছাত্রী পেল সাইকেল

নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৭০ জন ছাত্রীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে সাইকেল। ২২শে মে সোনাখাড়া ইউনিয়নের নিমগাজী ডিগ্রি কলেজ মাঠে এক অনুষ্ঠানে ধুবিল, সোনাখাড়া ও ধামাইনগর ইউনিয়নের মাধ্যমিক পর্যায়ের এসব ছাত্রীর হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।■

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

চাঁদের মাটিতে গাছ

এই প্রথম চাঁদের মাটিতে গাছ। বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো চাঁদ থেকে আনা মাটিতে বীজ দিয়ে চারা গজাতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এই গাছ পৃথিবীর গাছের তুলনায় একটু ধীরে ধীরে বাড়ছে। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ নিয়ে বহুদিন ধরেই গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। চাঁদে মানুষের বসবাস সম্ভব কি না সেই বিষয়েও গবেষণা চলছে। পৃথিবীর বাইরে কোথাও বসতি গড়তে হলে সেখানে অনেক কিছুরই প্রয়োজন হবে। তার মধ্যে সবার আগে দরকার হবে অক্সিজেন। এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল চাঁদের মাটিতে গাছ জন্মানো একেবারেই অসম্ভব। কারণ চাঁদের মাটি গাছ জন্মানোর মতো উর্বর নয়। কিন্তু সে কথা এখন ভুল প্রমাণিত হলো। নাসার কয়েকজন বিজ্ঞানী দেখালেন, চাঁদের মাটিতে গাছ জন্মানো এবং গাছের বেঁচে থাকা সম্ভব।

১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার চন্দ্রাভিযানের সময় নমুনা হিসেবে চাঁদ থেকে পৃথিবীতে মোট ৩৮২ কিলোগ্রাম পাথর আনা হয়। নাসা জানায়, মূলত অ্যাপোলো অভিযানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে চাঁদের মাটিতে গাছ জন্মানোর পরীক্ষাটি করার কথা ভাবেন বিজ্ঞানীরা। ওই অভিযানে চাঁদের মাটি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যই ছিল এটা নিয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। সেই পাথর ভেঙে গুঁড়ো করা মাটিতেই গাছ জন্মানোর কাজটি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার কয়েকজন বিজ্ঞানী। চাঁদ থেকে আনা মাত্র ১২ গ্রাম মাটি নিয়ে তাতে পানি ও সার যুক্ত করে গাছ জন্মিয়েছেন তারা।

গাছটির নাম অ্যারাবিডোপসিস থাইলিয়ানা। এই গাছ ফুলকপি, সরিষা ও ব্রোকলির মতো একই উদ্ভিদ পরিবারের অংশ। সম্পূর্ণ গবেষণা প্রতিবেদনটি জার্নাল অব কমিউনিকেশন বায়োলজিতে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রতিটি বীজই অঙ্কুরিত হয়েছে। তবে কিছু গাছ ভিন্ন রং ও আকার ধারণ করেছে এবং তারা পৃথিবীর মাটির গাছের তুলনায় ধীর গতিতে বেড়েছে। গাছের বৃদ্ধি তুলনার জন্য গবেষকরা পৃথিবীতেও কিছু বীজ রোপণ করেছিলেন। এই গবেষণাটি ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে করছে নাসা। ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযাত্রীরা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অভিযানে যাবেন, তখন তাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার গবেষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গত ৫০ বছর ধরে তারা দুটো প্রশ্নের পেছনে তাড়া করে ফিরেছেন। এক, চাঁদের মাটিতে গাছ জন্মানো সম্ভব কি না ও দুই, ভবিষ্যতে চাঁদে মানুষের বসবাস সম্ভব কি না। আর সেক্ষেত্রে এই গবেষণা বিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে পারবে। ■

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

পকেট স্কুল

পকেট স্কুল আবার কী? এটা কি পকেটে রাখা যায়? না বন্ধুরা, এই স্কুল পকেটে রাখা যায় না। তবে ঘরে বসে তোমাদের বাবা-মায়েরা স্কুলের সব খবরাখবর পেয়ে যাবেন এই স্কুলের মাধ্যমে। সন্তান ঠিকমতো স্কুলে যাচ্ছে কিনা বা তাদের গতিবিধিই বা কী সে চিন্তা থাকে প্রায় অধিকাংশ বাবা-মার। কিন্তু এবার সে চিন্তার অবসান হতে যাচ্ছে চট্টগ্রামের ছেলে আরিফুল ইসলামের উদ্ভাবিত পকেট স্কুল নামে স্কুল মানেজমেন্ট সলিউশন-এর মাধ্যমে। এ সফ্টওয়্যারের সহায়তায় অভিভাবকরা ঘরে বসেই জানতে পারবেন তার সন্তান কখন স্কুলে প্রবেশ করছে আর কখন বের হচ্ছে, স্কুলের নোটিশসহ নানা কার্যক্রমও। প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রামের কয়েকটি স্কুলে এ সেবা চালু করা হলেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সারা দেশে এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে চান আরিফুল। দেশের অধিকাংশ যুবকের স্বপ্ন পড়াশোনা শেষ করে ভালো চাকরি করা। কিন্তু পড়ালেখারত অবস্থায় ভিন্ন পথে হাঁটলেন চট্টগ্রামের আত্মপ্রত্যয়ী তরুণ আরিফুল ইসলাম। প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে শুধু নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেননি বরং কর্মসংস্থান করেছেন অর্ধশতাধিক যুবকেরও। শুরুতেই মোবাইল পকেট স্কুল নিয়ে কাজ শুরু করেন আরিফুল ও তার টিম। এটি এমন একটি সফ্টওয়্যার যার মাধ্যমে অভিভাবকের মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে চলে যাবে স্কুলের যাবতীয় তথ্যাদি। পকেট স্কুলের সেবায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে অভিভাবক ও শিক্ষকরা। সুযোগ পেলে সামনে পকেট স্কুলের মতো আরো সফ্টওয়্যার ডেভেলপ করে দেশের আইটি খাতে অবদান রাখতে চান আরিফুল।

কলমের ওজন ৩৭ কেজি

আমরা লেখার কাজে যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করে আসছি কলম। যার রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এর আকৃতিতে রয়েছে নানান বৈচিত্র্য। লম্বা, মোটা, সূঁচালো ছাড়াও নানা ধরনের কলম রয়েছে । বন্ধুরা বলো তো, একটি কলমের ওজন আর কতই বা হবে। যেন দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায় এজন্য এটি খুবই হালকাভাবে তৈরি করা হয়। কিন্তু বন্ধুরা, একটি কলমের ওজন যদি হয় ৩৭ কেজিরও বেশি তাহলে কেমন হবে বলো তো? হ্যাঁ বন্ধুরা, এমনই একটি বিশালাকার কলম বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ভারতের একজন ব্যক্তি। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বলপয়েন্ট কলম হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম উঠেছে সেটির। ভারতের হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা আচার্য মাকুনুরি শ্রীনিবাস বিশাল আকারের একটি বলপয়েন্ট কলম বানিয়েছেন। কলমটি ৫ মিটার বা ১৮ ফুটের বেশি লম্বা। ওজন ৩৭ দশমিক ২৩ কেজি। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস বুকের তথ্য অনুযায়ী, এর আগে এত বড়ো কলম বানানো হয়নি। এটাই বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বলপয়েন্ট। এই কলমটিকে কয়েকজন মিলে তুলে ধরতে হয় এবং এটি দিয়ে লিখতে গেলেও চার-পাঁচজনের প্রয়োজন হয়। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনির দৃশ্য খোদাই করা আছে কলমের গায়ে। ■

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দ ধাঁধা

পাশাপাশি: ১. একটি গ্রহের নাম, ৩. বাংলাদেশের একটি গ্রামীণ খেলা, ৫. লতিকা, ৬. মৃত্তিকা, ৭. উষ্ণ, ৯. সামান্য, ১০. রাত, ১২. একশত বছর

উপর-নিচ: ১. দেশের একটি সমুদ্রবন্দর, ২. একটি শীতকালীন সবজি, ৪.একটি শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী, ৭. শরীর, ৮. গগন, ১১. পাখির বাসা

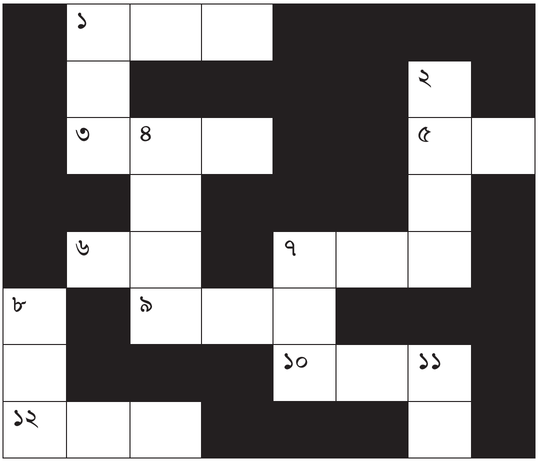

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: পদ্মা সেতু, সেতারা, গম, রাখাইন, তানপুরা, ছাইদানি, অভিজ্ঞতা, ধূমকেতু, সাপুড়ে

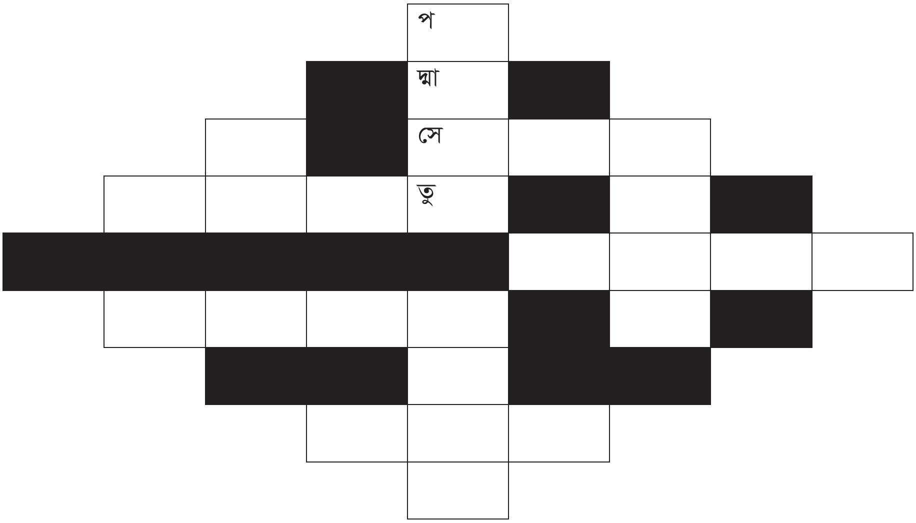

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপর-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৪৯				৪৫		১		৫
	৫৩			৫৬	৪৩		৩	
৫১		৬৩	৬২				১০	
	৬৫				৪১	১২		৮
৬৭		৭১	৬০	৫৯			১৪	
		৭২		৩৮	৩৯		১৯	
৭৯			৩৬	৩১		২১		১৭
	৮১				২৯		২৩	
৭৭		৭৫		৩৩		২৭		২৫

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৮	*		-	৫	=	
*	■	+	■	+	■	+
	*	৪	-		=	৫
-	■	-	■	-	■	-
৯	/		+	২	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	২	-		=	৩

এপ্রিল মাসের সমাধান

শব্দ ধাঁধা

ই	উ	ক্রে	ন				
ং			ও	ষু	ধ		
রে			গাঁ		ব	র্ণ	না
জি	ন				ল		রা
	তু	ষা	র				য়
কা	ন				প্র	য়া	ণ
	ত্ব			কা			গ
			সু	না	ম	গ	ঞ্জ

ছক মিলাও

				প				
				দ্মা				
		গ		সে	তা	রা		
	ধূ	ম	কে	তু		খা		
					ছা	ই	দা	নি
	অ	ভি	জ্ঞ	তা		ন		
				ন				
			সা	পু	ড়ে			
				রা				

নাম্ব্রিক্স

৪৯	৪৮	৪৭	৪৬	৪৫	৪৪	১	৪	৫
৫০	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৪৩	২	৩	৬
৫১	৫২	৬৩	৬২	৫৭	৪২	১১	১০	৭
৬৬	৬৫	৬৪	৬১	৫৮	৪১	১২	৯	৮
৬৭	৭০	৭১	৬০	৫৯	৪০	১৩	১৪	১৫
৬৮	৬৯	৭২	৩৭	৩৮	৩৯	২০	১৯	১৬
৭৯	৮০	৭৩	৩৬	৩১	৩০	২১	১৮	১৭
৭৮	৮১	৭৪	৩৫	৩২	২৯	২২	২৩	২৪
৭৭	৭৬	৭৫	৩৪	৩৩	২৮	২৭	২৬	২৫

ব্রেইন ইকুয়েশন

৭	+	৩	-	৬	=	৪
-		*		*		*
২	*	২	+	১	=	৫
+		-		-		-
৪	*	১	-	২	=	২
=		=		=		=
৯	+	৫	+	৪	=	১৮

ছোটোদের আঁকা

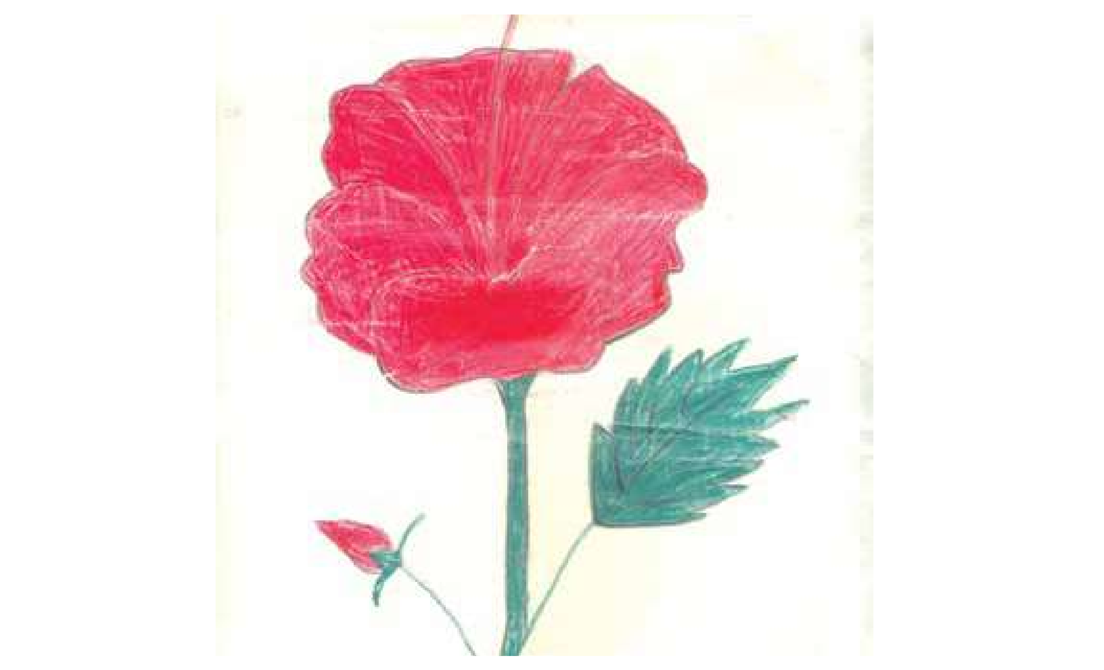

▶ **ইরিনা হক**, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, ইএসএস স্কুল, ঢাকা

▶ **মো. রাশেদুল ইসলাম**, ২য় শ্রেণি, ইন্দ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা

সানজিদা আক্তার রূপা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

আনিশা চৌধুরী, ১ম শ্রেণি, ম্যাপল লীফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ নবারুণ পড়তে স্মার্ট ফোন থেকে google play store-এ nobarun লিখে মোবাইল অ্যাপ্স ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

- মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
- বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
- বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
- বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
- বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
- বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-46, No-11, May 2022, Tk-20.00

মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে,
মাকে মনে পড়ে, আমার মাকে মনে পড়ে

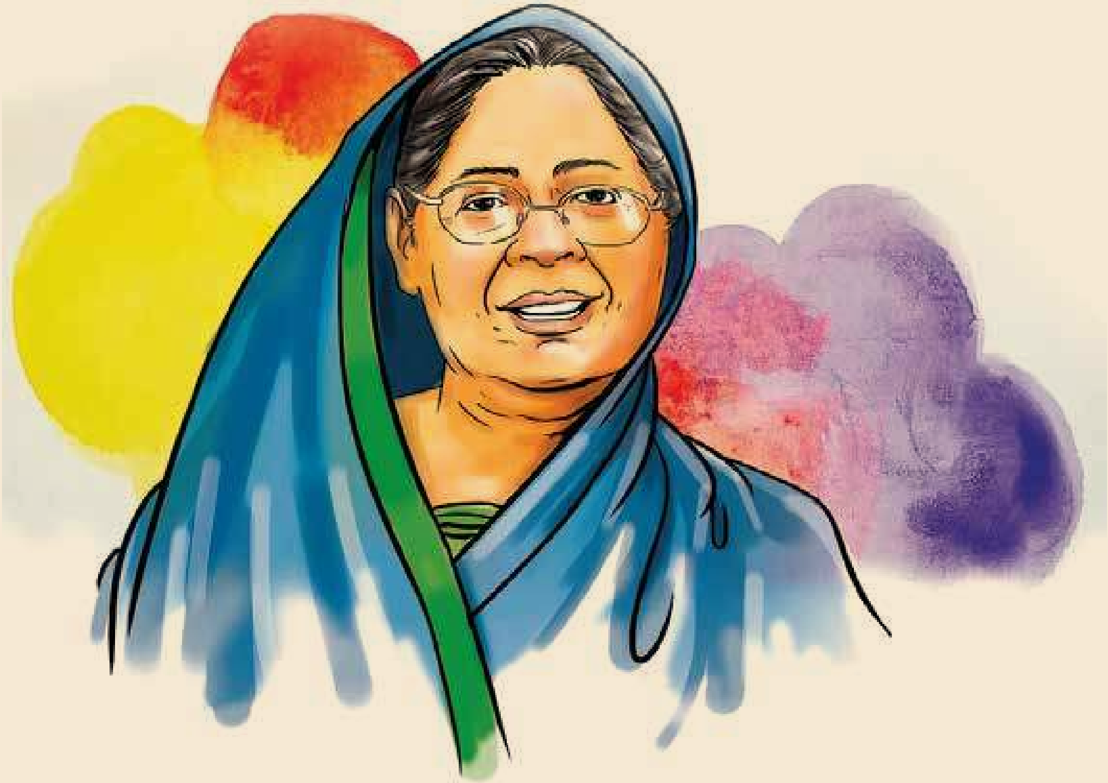

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা